রাণী ভবানী

নিশীথরঞ্জন রায়
সম্পাদিত

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট। ক লি কা তা ৬

ভূমিকা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর ইতিহাস-চর্চার প্রথম ফসল তুলে ধরেন আজ থেকে ৯০ বছর আগে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা জীবনী-ভিত্তিক ইতিহাস 'সিরাজউদ্দৌলা' এবং 'সীতারাম'। এর আট বৎসর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'মীরকাসিম' (১৯০৬ খৃঃ)। পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করে 'ফিরিঙ্গি বণিক' (১৯২২)। ইতিহাসের সেইসব কৃতী পুরুষদের কেন্দ্র করে যে ঘটনাস্রোত আবর্তিত হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরে অক্ষয়কুমার প্রমাণিত করেছেন যে প্রথম জীবনে তাঁর ইতিহাস-চর্চার মূল প্রেরণা ছিল আঠার শতকের বাঙলা ও বাঙালী। আঠার শতক নানা কারণেই দীর্ঘকাল ধরে ইতিহাসের দরবারে ছিল উপেক্ষিত। এই ভাঙা-গড়ার যুগকে অনেকেই মনে করতেন Dark Age-এর অনুরূপ কিম্বা কাছাকাছি এক যুগ। অনেকে আঠার শতকের সঙ্গে পাঁচশো বছর আগেকার তের শতাব্দীর জের টেনে উর্দুভাষী কবি হালির মতো ভাবতেন— 'ইধর হিন্দ্ মে হরতরফ অন্ধেরা'। বাণিজ্য আর মসনদ নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি মারামারি চলছে, পুরনো রাজনৈতিক কাঠামোর জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে বিদেশী রাজশক্তির মদতপুষ্ট বণিক-প্রাধান্য স্থাপনের তোড়জোড়, সেই সময়কার ইতিহাস লিখেছেন বহু বিদেশী ঐতিহাসিক। সমসাময়িক যুগের রাজ-পুরুষেরা লিখে গেছেন তাঁদের ডায়েরী, জার্নাল, মেমোয়ার্স। কেউ কেউ ইতি-হাসের উপকরণ শুধু নয়, ইতিহাস-বিষয়ক বইও লিখেছেন। এছাড়া রয়েছে সরকারী, আধা-সরকারী নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ।

আঠার শতকের ভারতের ইতিহাসের জাল বুনতে গিয়ে স্বভাবতই সুবে বাঙলার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সর্বাধিক মাত্রায়, কারণ এখানেই ঘটেছিল আঠার থেকে উনিশ শতকে উত্তরণের সূত্রপাত। তবু পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে বাঙালী তথা ভারতীয় অনুসন্ধিৎসুদের মনে হবে বিদেশীদের লেখা আঠার শতকের রাজবৃত্ত শুধু অসম্পূর্ণই নয়; তথ্যের দিক থেকেও এ ধরণের রচনার মধ্যে রয়েছে নানা ধরণের অসঙ্গতি, এমনকি বিকৃতি। সুতরাং বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাসের নতুন মূল্যায়ন অনেকের কাছেই ছিল অভিপ্রেত। এই প্রয়োজনবোধকে স্বীকৃতি জানিয়ে যাঁরা এগিয়ে এলেন ইতিহাস-চর্চায় নতুন অধ্যায় রচনার দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের মধ্যে অগ্রণী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—

১৯৩০)। রাজশাহী-নাটোরের অধিবাসী হিসাবে এই জনপদটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে গোড়া থেকেই তাঁর মনে ছিল পূর্ণ সচেতনতাবোধ। এখানকার জমিদারবংশের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল বাঙলার অর্ধাংশ জুড়ে; স্থাপত্যের বহু নিদর্শন এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, প্রায়-হারিয়ে-যাওয়া যুগের ইতিহাসের মূক সাক্ষী হিসেবে; একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী দিল্লী, অপরদিকে প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্মকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ—এ দু'য়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাজশাহী জমিদারীর; ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এর প্রবেশ ও আনাগোনা রচনা করেছে বহু নাটকীয় মুহূর্ত; তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মের মিলন-ক্ষেত্র হিসেবে এ জনপদটি আঠার শতকের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অর্জন করেছিল এক বিশিষ্ট আসন—সবকিছু নিয়ে অক্ষয়কুমার এসবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইতিহাস-চর্চার এক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ক্ষেত্র।

অক্ষয়কুমার চেয়েছিলেন দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাঙলা ভাষায় ইতিহাস রচনা করতে। তারই ফলশ্রুতি 'সিরাজ-উদ্দৌলা'। এই গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> "...প্রথম শিক্ষাকালে ইংরেজের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতাম। তাহা আমাদিগকে যতই ব্যথিত করুক তাহার যে প্রতিবাদ সম্ভবপর, তাহার যে প্রমাণ-আলোচনা আমাদের আয়ত্তগত এ-কথা আমাদের বিশ্বাস হইত না। নীরবে নতশিরে আপনাদের প্রতি ধিক্‌কারসহকারে সমস্ত লাঞ্ছনাকে সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞানে বহন করিতে হইত।
>
> এমন অবস্থায় আমাদের দেশের যে-কোনো কৃতী গুণী ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন তিনি আমাদের দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাপাত্র।" (আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, ১৩৪৮, পৃ. ৫০৩-৫০৪।)

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে আদ্যপ্রান্ত পূর্ণ সমর্থন জানাননি। তাঁর অভিমত অক্ষয়কুমার "শান্তভাবে কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।"

'সিরাজউদ্দৌলা' কিংবা 'মীরকাসিমে'র মতো নবাবদের চরিত্র এবং

কার্যাবলীর মধ্যেই সীমিত থাকেনি অক্ষয়কুমারের অনুসন্ধিৎসা। যে ফিরিঙ্গি বণিকরা পনেরো-ষোল শতক থেকেই ভারতের উপকূল অঞ্চলে তাদের বাণিজ্যিক একাধিপত্য এবং যতোটা সম্ভব রাজনৈতিক প্রভাব স্থাপনে তৎপর ছিল তাদের নিয়েও অক্ষয়কুমার রচনা করেছেন তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস। গ্রন্থকারের নিজের কথায়—

> "ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না; অথচ তাহা আধুনিক সভ্য সমাজের অভূতপূর্ব ভাগ্য-বিবর্তনের প্রধান কথা,— যেমন কৌতূহলপূর্ণ, সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ।"

২

এর পরবর্তী পর্যায়ে অক্ষয়কুমার বেছে নিলেন নবাব-মহলের বাইরের জগত থেকে দু'টি চরিত্র, দু'টিই ভারতীয়, বাঙালী চরিত্র—রাণী ভবানী (১৩০৪) এবং সীতারাম (১৩০৫)। প্রথম চরিত্রের নামশীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় চরিত্রটি নিয়ে রচিত গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩০৫। 'রাণী ভবানী' 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশের পিছনে একটি করুণ অথচ কৌতুকপ্রদ কাহিনী প্রচ্ছন্ন রয়েছে। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের প্ররোচনায় রাণী ভবানী সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন অক্ষয়কুমার। কথা ছিল, মহারাজের ব্যয়ে বইটি ছাপা হবে এবং লণ্ডন থেকে হাফটোন ব্লক তৈরি করিয়ে ছবি ছাপিয়ে আনা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

উনিশ শতকের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সাংবাদিক হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) ছিলেন অক্ষয়কুমারের শিক্ষক তথা সাহিত্যগুরু। হরিনাথ তাঁর সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় জমিদার ও নীলকরদের কৃষক-নিপীড়নের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশ করে নীলকর, জমিদার ও শাসকবর্গের বিরাগভাজন হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হরিনাথের মৃত্যুর পর অক্ষয়কুমার তাঁর নির্ভীকতা ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করে যে প্রবন্ধ লেখেন ('সাহিত্য', বৈশাখ ১৩০৪) তাতে সেই অত্যাচারী জমিদারের উল্লেখ করা হয় এইভাবে: 'তিনি এ দেশের সাহিত্য-সংসারে এবং ধর্মজগতে চিরপরিচিত,…।' ফলে, জমিদারের

বংশধরেরা অক্ষয়কুমারের প্রতি রুষ্ট হন। এঁদের সঙ্গে জগদিন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁদের অনুরোধে মহারাজা 'রাণী ভবানী' ছেপে দেবার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করেন। তখন অক্ষয়কুমার গ্রন্থাকারে প্রকাশের আশা ত্যাগ করে রচনাটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন। 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্বভাবতই এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান।

'রাণী ভবানী' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির সঙ্কলন নিয়ে প্রায় নব্বুই বছর পর স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হলো এই গ্রন্থটি। পুরনো যুগের পত্র-পত্রিকা সহজলভ্য নয়। তাই প্রায়-হারিয়ে-যাওয়া উপকরণগুলো উদ্ধার করে যাঁরা এই গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্ভব করলেন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের তথ্যানুসন্ধানী বাঙালী পাঠকদের কাছে তারা ধন্যবাদার্হ হবেন।

এখানে লক্ষণীয় যে অক্ষয়কুমার যখন 'মীরকাসিম' এবং 'রাণী ভবানী' নিয়ে যথাক্রমে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাবলী রচনায় লিপ্ত, তখন সারা বাঙলা জুড়ে চলছে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী প্রচণ্ড আলোড়ন—স্বাদেশিকতার প্রবল উচ্ছ্বাস, বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, প্রতিবাদ সভা, পদযাত্রা, রাখীবন্ধন, অরন্ধন, সরকারী নির্যাতন, জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রসার ইত্যাদি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তখন জনমত বিদ্বিষ্ট। সংবাদপত্রের স্তম্ভে, সভা-সমিতিতে, সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, নাটকে, ইতিহাসে, গল্পে, উপন্যাসে—সর্বত্র স্বদেশীয়ানার ব্যাপক প্রভাব। বিশ শতকের গোড়ার দিকে যে-সব প্রবন্ধকার অথবা গ্রন্থকার তাঁদের রচনায় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গেছেন তাঁদের অন্যতম ইতিহাসবিদ্ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

'রাণী ভবানী' নামটি বাঙালী জনসাধারণের কাছে যতোখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে এখনও উচ্চারিত হয়, ততোখানি মাত্রায় রাণীর ইতিহাস তাদের কাছে বহুদিন জানা ছিল না। রাণী ভবানীর কীর্তিকলাপের বিবরণ ও মূল্যায়ন নিয়ে বহুকাল পর্যন্ত কোন ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়নি। রাণীর নাম আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি। তাঁর বদান্যতার কথা আমরা জানি। জনহিতকর কাজে তাঁর উৎসাহ ও সাহায্য সম্পর্কেও আমরা অবহিত কিন্তু জনশ্রুতি ছাড়া অন্য উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা থেকে আমরা দীর্ঘকাল বিরত ছিলাম।

দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র এবং প্রাসঙ্গিক যাবতীয় উপাদানের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনার যে লক্ষ্যে আস্থাশীল ছিলেন অক্ষয়কুমার

ভূমিকা

'সিরাজউদ্দৌলা'র পর সেই লক্ষ্যপথে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ 'রাণী ভবানী'। তখন যেসব উপাদান পাওয়া সম্ভব ছিল, যেমন কোম্পানীর কাগজপত্র, কোম্পানীর কর্মচারীদের লেখা বই, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, এতদ্দেশীয় রাজবংশাবলী—সব ক'টিরই সদ্ব্যবহার করেছেন গ্রন্থকার। তাঁছাড়া ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়নি এমন ধরণের জমিদারী এস্টেট্-এর নথিপত্রও ব্যবহার করেছেন তিনি। পরবর্তীকালে নতুন নতুন বহু উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর ফলে অক্ষয়কুমারের সেই যুগের তথ্যভিত্তিক দু-চারটি সিদ্ধান্ত আজ আর সমর্থিত হয় না। অনেক সময় তিনি ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হতেন যা 'সিরাজ-উদ্দৌলা'র সমালোচনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেছেন।

আসলে অক্ষয়কুমার আমাদের ইতিহাস-চর্চার দৈন্য সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। ক্লাইভ-হেষ্টিংসের আমলের সাহেবদের কীর্তিকলাপ নিয়ে যতো আলোচনা হয়েছে এতদ্দেশীয় সমসাময়িক ব্যক্তিদের নিয়ে তার তুলনায় প্রায় কিছুই হয়নি। ইংরেজ লেখকদের কৃপায় আমরা সেই আমলের বড় মেজ ছোট সাহেব-সুবোদের নাম-ধাম জানি কিন্তু ভারতীয় চরিত্রগুলি যা আমাদের কুতূহল জাগ্রত করে তাদের কথা আমরা খুব কমই জানি। অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ইতিহাস-চর্চার এই দৈন্য দূর করার প্রচেষ্টায় সাফল্য। আঠার শতকের একাধিক ভারতীয় চরিত্র তাঁর গবেষণার ফলে আজ আমাদের কাছে প্রায় পুরোমাত্রায় ধরা পড়েছে। রাণী ভবানী সম্পর্কে আমাদের জানা-শোনার সূত্র বহুকাল পর্যন্ত ছিল জনশ্রুতি। অক্ষয়কুমার এই মহীয়সী মহিলার রক্তমাংসে গড়া, ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করা চেহারাটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। শুধু রাণী ভবানীই নন, সীতারাম, সিরাজউদ্দৌলা, অন্ধকূপ হত্যা, মীরকাসিম সবাইকে তিনি হাজির করিয়েছেন ইতিহাসের দরবারে। তাঁর গবেষণার ফলে আঠার শতকের অনেকখানি অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে।

ইতিহাস-চর্চায় অক্ষয়কুমারের যে বৈশিষ্ট্যটি সর্বাধিক মাত্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো এই যে তিনি ইতিহাসের কোন একটি বিশেষ যুগ অথবা কাল-বিভাগের মধ্যে তাঁর গবেষণাকে সীমিত রাখেননি। ইতিহাস-চর্চার শুরুতে তিনি বেছে নিয়েছিলেন আঠার শতক। তারপর গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে তিনি বেছে নিলেন বাঙলার প্রাচীন যুগ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ এবং জ্ঞান পরম্পরের সঙ্গে

সমতা রেখে চলেছিল। সংস্কৃত, বাঙলা এবং ইংরেজী ভাষায় গভীর জ্ঞান, বক্তব্য উপস্থাপনের উপযোগী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির উপর ছিল তাঁর অসামান্য দখল।

প্রাচীন বাঙলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, প্রভৃতি পুরাকীর্তি, শিলালিপি ও তাম্রলেখ ইত্যাদি ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ও রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি গড়ে তুললেন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। এই সমিতির উদ্যোগে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো 'গৌড়লেখমালা'। এটি এক কালজয়ী সূত্রনির্দেশিকা। অক্ষয়কুমার তথা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অপর কীর্তি Inscriptions of Bengal-এর তৃতীয় খণ্ডের সঙ্কলন ও প্রকাশনা। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে যে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্পর্কে আগ্রহশীল অনুসন্ধিৎসু মানুষ কোনদিন তা বিস্মৃত হবে না।

এ ছাড়া অক্ষয়কুমারই সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষায় ইতিহাস-চর্চার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত করেন ত্রৈমাসিক 'ঐতিহাসিক চিত্র'। এই পত্রিকার প্রস্তাবনায় অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন :

> "আমাদের ইতিহাসের অনেক উপকরণ বিদেশীয় পরিব্রাজকগণের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ; তাহা বহুভাষায় লিখিত বলিয়া আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত ও অনাদৃত।…নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণকাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদার বংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই (এই প্রস্তাবিত পত্রের) মুখ্য উদ্দেশ্য।"

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অক্ষয়কুমারের এই নতুন প্রচেষ্টা পেয়েছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অননুকরণীয় ভাষায় লেখা

> "হউক বা না হউক আমাদের ইতিহাসকে আমরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীনদৃষ্টিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিয়াছে…পরদত্ত চোখের ঠুলি চিরদিন বাঁধারাস্তায় ঘুরিবার যতই উপযোগী হউক, পরীক্ষার ঘানিবৃক্ষের তৈলনিষ্কাশনকল্পে যতই প্রয়োজনীয় হউক নূতন সত্য অর্জন ও পুরাতন ভ্রম বিবর্জনের উদ্দেশে অব্যবহার্য।

'ঐতিহাসিক চিত্র', ভারত-ইতিহাসের বন্ধনমোচন-জন্য ধর্মযুদ্ধের

ভূমিকা

আয়োজনে প্রবৃত্ত। আশা করি ধর্ম তাহার সহায় হইয়া তাহাকে রক্ষা ও তাহার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করিবেন। অথবা

ধর্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।"

অক্ষয়কুমারের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। সম্প্রতিকালে তাঁর প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশিত হচ্ছে—এটি নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষণ।

নিশীথরঞ্জন রায়

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

বংশাবলী

রাজসাহী প্রদেশে[১] ছাতিনগ্রাম নামে একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লীগ্রাম ছিল। গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নহে,—কিন্তু এখন আর সেকালের শ্রী-সৌভাগ্য কিছুই নাই। চারিদিক বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেবল স্থানে স্থানে দুই-চারিটি পুরাতন দীঘি পুষ্করিণী এবং কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ পূর্বগৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে! গ্রামবাসীদিগের বিশ্বাস যে, সেকালে একজন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা এই গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেন। সে রাজ্যের কোন চিহ্ন নাই; সে রাজবংশেরও কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না;—তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সেই হিন্দুরাজ্যের নাম সপ্তপর্ণগ্রাম ছিল, তাহাই এখন ছাতিনগাঁ নামে পরিচিত হইয়াছে।

নবাবী আমলে ছাতিনগাঁর চৌধুরীবংশের সবিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল, গ্রামের অবস্থাও কথঞ্চিৎ ভাল ছিল বলিয়াই শুনিতে পাওয়া যায়। তৎকালে আত্মারাম চৌধুরী নামে একজন ধনাঢ্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। এখনও স্থানে স্থানে আত্মারামের উচ্চ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে এখন আত্মারামের কথা ভুলিয়া গিয়াছে,—কিন্তু আত্মারাম-দুহিতা রাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাঙ্গালীর সাহিত্যে, ইতিহাসে, কবিতায় এবং জনশ্রুতিতে মিলিত হইয়া, সকলের নিকটেই চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

যেখানে রাণী ভবানীর জন্ম হয়, সেই স্থানটি এখন কতকগুলি অযত্ন-সম্ভূত লতাগুল্মে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। ভবানী নিজ জন্মস্থানের পুণ্যভূমি নির্দেশ করিয়া তাহার উপর এক রমণীয় দেবমন্দির নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে মাতার নামানুসারে জয়দুর্গা নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া-

ছিলেন। জন্মভূমির উপর চিরদিন দেবার্চনা হইবে বলিয়া রাণী ভবানী জয়তুর্গার নিত্যপূজা ও মহোৎসবাদির জন্য পার্শ্ববর্তী ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের সম্মুখে জয়তুর্গার মন্দির, মন্দিরের পার্শ্বে রন্ধনশালা, এবং প্রবেশপথে সুরচিত তোরণযুক্ত সিংহদ্বার গঠিত হইয়াছিল। সেই তোরণশিরে বসিয়া প্রভাতে সায়াহ্নে বৈতালিকগণ সুললিত রাগ রাগিণীতে জয়তুর্গার জয়গান করিত, সশস্ত্র প্রহরী প্রহরে প্রহরে সদর্পে পাদচারণ করিয়া বেড়াইত, এবং উৎসবসময়ে তোরণ-দ্বারে ধূম-জ্যোতি বিকীরণ করিয়া ভবানীর কামান থাকিয়া থাকিয়া গর্জন করিয়া উঠিত। এখন সে সৌভাগ্যগর্ব জনশ্রুতিতে পরিণত হইয়াছে; জয়তুর্গার মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; সেই ভগ্নাবশেষের উপর লতাগুল্ম দেহ বিস্তার করিয়াছে; একখানি পর্ণ-কুটীরে জয়তুর্গা আশ্রয় লাভ করিয়া নিত্যপূজা গ্রহণ করিতেছেন। দীঘির জল মসীমলিন হইয়া উঠিয়াছে; সিংহদ্বার ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়াছে; লতাবিতানে মুখ লুকাইয়া ইষ্টকস্তূপের মধ্যে ভবানীর কামান জরাজীর্ণ কলেবরে কালাতিপাত করিতেছে। সকলই শ্রীহীন হইয়াছে,—কিন্তু তথাপি সেই পুণ্যভূমির ধূলিমুষ্টির সহিত রাণী ভবানীর পুণ্যস্মৃতি যেন জীবন্তভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে!

যে সময়ে পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্য পরমুখ-প্রত্যাশী বিলাস-লোলুপ নামসর্বস্ব দিল্লীশ্বরের কুক্ষিচ্যুত হইতেছিল; যখন বাহুবল এবং ষড়যন্ত্রই সমুদায় রাষ্ট্রনীতির অদ্বিতীয় মীমাংসক হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহা-বিপ্লবকালে জন্মগ্রহণ করিয়া, সম্পদে বিপদে নানা ঘটনাচক্রের আবর্তনে পড়িয়াও রাণী ভবানী অর্ধ-শতাব্দী কাল রাজসাহীর বিস্তৃত রাজ্যের শাসন-ভার পরিচালন করিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় যে সকল পুণ্যকীর্তির সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী তাহা অল্পদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইতেছে।

আজকাল "রাজসাহী" বলিতে যত ছোটখাটো একটি জেলা বুঝায়, সেকালে তাহা বুঝাইত না। সেকালের রাজসাহীরাজ্য পরিদর্শন করিয়া

একজন ইংরাজ* লিখিয়া গিয়াছেন যে, "গত শতাব্দীর মধ্যভাগে রাণী ভবানীর অধিকৃত রাজসাহীর বিস্তৃত রাজ্য ভ্রমণ করিয়া আসিতে ৩৫ দিন সময় লাগিত। সেই বিস্তীর্ণ জনপদের বার্ষিক আয় এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, তাহা হইতে বৎসর বৎসর ৭০ লক্ষ্য টাকা নবাব-সরকারে রাজকর প্রদান করিতে হইত।" আর একজন অনুসন্ধাননিপুণ সমসাময়িক ইংরাজ লেখক বলেন যে, "বঙ্গদেশে,—এমন কি সমুদয় ভারতবর্ষে, রাজসাহীর মত এত বড় জমিদারী আর কোথায়ও ছিল কি না সন্দেহ। ইংরাজ কুঠিয়ালদিগের অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য এবং অত্যুৎকৃষ্ট রেশম এই জমিদারীর মধ্যেই উৎপন্ন হইত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও রাজসাহী, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, যশোহর, বীরভূম ও বর্ধমানের অধিকাংশ জনপদ এই জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজ-শাসনের আরম্ভ সময়ে রাজসাহীর আয়তন ১২৯০৯ বর্গমাইল স্থিরীকৃত হইয়াছে।"*[২]

নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা রামজীবন এই বিস্তৃত রাজ্যের প্রথম রাজা, এবং তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া পুত্রবধূ মহারাণী ভবানী সেই বিখ্যাত রাজবংশের উজ্জ্বল রত্ন। নাটোর রাজবংশের সে বিস্তৃত রাজ্য আর নাই, কালক্রমে তাহা সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু রাণী ভবানীর বংশধর বলিয়া, কি স্বদেশে কি বিদেশে, তাঁহাদিগের পদগৌরব ও রাজসম্মান এখনও অটুট রহিয়াছে।

পৃথিবীতে কাহারও চিরদিন সমান যায় না। অধঃপতিত বাঙ্গলাদেশেরও এক সময়ে গৌরবের দিন আসিয়াছিল। সেই গৌরবের দিনে, শতসৌধ-বিভূষিত গৌড়নগরীর উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া, পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণ কাশী কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। সে

* J. Z. Holwell, *Interesting Historical Events relative to the Province of Bengal and the Empire of Hindusthan, 1765-71.*

* J. Grant, *Analysis of the Finances of Bengal* **published as Appendix in the Fifth Report, Vol II, edited by W. K. Firminger, Calcutta, 1917**

গৌরবের দিন চলিয়া গিয়াছে ;—আছে কেবল দুই-চারিখানি জরাজীর্ণ প্রস্তর-ফলক ; তাহাই লইয়া স্বদেশ বিদেশের পরিব্রাজকগণ শ্মশানভস্মের মধ্যে অতীত-গৌরবের বিলুপ্তকাহিনীর অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

অনুসন্ধান-নিপুণ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অনুমান ১০৪০ খৃষ্টাব্দ বা তৎসমকাল হইতে পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি বিগ্রহপালকে পরাজয় করিয়া হিন্দুধর্মানুরাগী আদিশূর বাঙ্গলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। †

আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবেদাঙ্গপারগ যে পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ-জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করাইয়াছিলেন,[৩] তাঁহাদের মধ্যে কাশ্যপ-গোত্রীয় সুষেণ মুনি একজন। নাটোর রাজ-বংশীয়গণ এই সুষেণবংশের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

আদিশূরের পরবর্তী সময়ে প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রশূরের শাসনকালে, বাঙ্গলাদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্বে করতোয়া, —এই দুই নদীর মধ্যস্থ স্থান বরেন্দ্রশূরের নামানুসারে বারেন্দ্রভূমি (পাঠান্তর বরেন্দ্রভূমি) বলিয়া পরিচিত হয়। স্বনামখ্যাত বল্লালসেন ব্রাহ্মণ-দিগের বাসস্থানের নামানুসারে রাঢ় ও বারেন্দ্র আখ্যা প্রদান করেন। সেই সময়ে সুষেণের অধস্তন অষ্টম পুরুষে স্বর্ণরেখ ও ভবদেব নামে দুই ভাই বর্তমান ছিলেন ; স্বর্ণরেখ ও তাঁহার সন্ততিগণ বারেন্দ্রদেশে বাস করিতেন বলিয়া বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন।

† বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র-বিশারদগণও বলিয়া থাকেন—

"সকল-গুণসমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
হুতবহ-সমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥
তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপাল বংশং
শশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবং শশাস
আগত্য গৌড়ং নৃপতেরনুজ্ঞয়া নাম্না বরেন্দ্রং বহুশস্যযুক্তং
আশ্রিত্য দেশং খলু বিপ্রবর্য্যা বাসং প্রচক্রুর্বহুমানযুক্তাঃ॥"

ব্রাহ্মণদিগের আচার ও চরিত্রগত পার্থক্য দেখিয়া বল্লালসেন তাঁহাদিগের কুলমর্যাদা নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই মর্যাদা-নিরূপণের সময়ে কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ-বংশের ক্রতু ও মতু নামে দুই ভাই রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বাসগ্রামের নামানুসারে ক্রতু ভাদুড়ী ও মতু মৈত্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাটোর-রাজবংশধরগণ সেই মৈত্র-বংশের সন্তান।

বল্লালসেনের সময়ে মতু ও তাঁহার সন্তানগণ কুলীন-পদবী লাভ করিয়াছিলেন। মতুর বংশে সুষেণের অধস্তন ষোড়শ পুরুষে কেশব মৈত্রেয় জন্মগ্রহণ করেন; তিনি কুলীন বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র জীবর মৈত্রেয় চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর "উপকারের করণে" লিপ্ত হইয়া কুলচ্যুত হন।* একবার কুলচ্যুত হইলে আর কেহ কুলীন হইতে পারেন না; সুতরাং জীবর মৈত্রেয়ের বংশধরগণ আর কৌলীন্য-মর্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। নাটোর রাজবংশধরগণ এই জীবর মৈত্রেয়ের বংশজাত।[৪]

বল্লালী আমলে বাসগ্রামের নামানুসারে ব্রাহ্মণদিগের "গাঁই" অর্থাৎ পদবী নির্ণীত হইত। নবাবী আমলে নিত্য নূতন পদবীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। যাঁহারা মুসলমানসরকারে কোনরূপ রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ নানাবিধ যাবনিক উপাধিলাভ করিয়া আজিও তাহা গৌরবের সহিত বহন করিয়া আসিতেছেন। মুসলমান রাজ্য আর নাই;—কিন্তু রায়, চৌধুরী, মজুমদার, খাঁ, মুন্সী, সরকার প্রভৃতি মুসলমানদত্ত উপাধি এখনও হিন্দু মুসলমানে সমভাবে বহন করিয়া আসিতেছেন। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া জীবর মৈত্রেয়ের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষে কামদেব মৈত্রেয় "সরকার" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই কামদেব সরকার নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ।

কামদেব সরকার পুঁঠিয়াধিপতি নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে পরগণে

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

লস্করপুরের অন্তর্ভুক্ত বারইহাটী গ্রামের তহশীলদার ছিলেন। সেই কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে সর্বদাই পুঁঠিয়ার রাজধানীতে গমনাগমন করিতে হইত। পুঁঠিয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন; তাঁহাদের বংশগৌরবের উপযোগী পুণ্যকীর্তিরও অভাব ছিল না। তৎকালে পুঁঠিয়া বিদ্যাশিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিয়াছিল; রাজানুকম্পায় বিবিধশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তথায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া অকাতরে বিদ্যাদান করিতেন। কামদেবের তিন পুত্র রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম পুঁঠিয়ার রাজধানীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন।

মধ্যমপুত্র রঘুনন্দন বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রতিভাশালী শাস্ত্রবিশারদ রাজমন্ত্রী বলিয়া পরিচিত। রঘুনন্দন অতি অল্পবয়সেই সেই প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তিনি রাজানুকম্পায় সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া অতি অল্পবয়সেই পুঁঠিয়ার রাজসরকারে একজন ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ কার্যকুশল রাজকর্মচারী বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

প্রতিভার সঙ্গে জনশ্রুতির চির-সংস্রব। রঘুনন্দন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামজীবনের সম্বন্ধেও একটি কৌতুকাবহ অলৌকিক জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, রামজীবন ও রঘুনন্দন পুঁঠিয়ার রাজসরকারে দেবপূজকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন রামজীবন শ্রান্তদেহে পুষ্পোদ্যানে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা আসিয়া দেখিলেন যে, এক বিষধর কালসর্প ফণাবিস্তার করিয়া রামজীবনকে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। এইরূপ অলৌকিক ঘটনা রাজ্যলাভের পূর্বসূচনা বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল; রাজা সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, রামজীবন ও রঘুনাথকে ডাকাইয়া, অতি সংগোপনে তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকে এইরূপে ধর্মপ্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, কালে তাঁহারা রাজা হইলে যেন পুঁঠিয়ার রাজ্যে কখনও হস্তক্ষেপ না করেন। এই জনশ্রুতির মূল্য কি, কবে কোথা হইতে কোন সূত্রে ইহার উৎপত্তি,—তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই

লোকমুখে ইহা এতই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে যে, নাটোর রাজবংশের কাহিনী লিখিতে গিয়া বাঙ্গালী লেখকমাত্রেই এই অলৌকিক জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজসাহীর রাজাদিগের পরিচয় দিতে গিয়া স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতা রিভিউ পত্রে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাতেও ইহার উল্লেখ আছে; কিন্তু তিনি রামজীবনের পরিবর্তে রঘুনন্দনের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।*

এই জনশ্রুতি কালে ইতিহাসেও স্থানলাভ করিয়াছে; কিন্তু সকল স্থলেই "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। একজন তহশীলদারের পুত্রকে উত্তরকালে রাজ্যলাভ করিতে দেখিয়া, ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা বা কার্যকারণশৃঙ্খলার যথোপযুক্ত বিচার না করিয়া কল্পনালোলুপ জনসাধারণ যে রামজীবন ও রঘুনন্দনের সম্বন্ধে দুই-চারিটি জনশ্রুতির সৃষ্টি করিবে, তাহা একেবারে অসম্ভব নহে।

* "Raghunandana was employed in the Putiya family. He at first served in an humble capacity, but he subsequently rose to power and affluence, partly through the influence of that family, and partly through his own intelligence, cunning and unscrupulousness. It was originally his business, as we have already stated, to gather flowers for the Puja of the family idols. Tradition says that on one occasion while he was employed in this vocation, he was fatigued and fell asleep in a garden, and a snake was observed to spread its hood over his head to protect him from the scorching sun. This circumstance being reported to Darpanarain Rai, the head of the Putiya family, he was surprised at it, and predicted from it the future greatness of Raghunandana. He sent for Raghunandana, assured him that he would be a great Raja and extorted from him a promise not to dispossess his family by fair or foul means, of the Pergana Lashkarpore".—*The Rajas of Rajshahi*, Kishori Chanda Mitra, Calcutta Review, vol Lvi

রামজীবন ও রঘুনন্দন যখন বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মহাবিপ্লবের সূচনা হইতেছিল। তখন আরঙ্গজীব বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন,—চারিদিকে তাঁহার বাহুবল ও ততোধিক কূটবুদ্ধির অপূর্ব কৌশলের প্রকাণ্ড অভিনয় আরব্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাদশাহ আরঙ্গজীবের নাম অনল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কঠোর শাসনের সহস্র নিদর্শনে ভারতবর্ষের হিন্দুতীর্থগুলি আজিও পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; আজিও বারাণসী, বৃন্দাবনের হিন্দু দেবমন্দিরের উন্নত ভিত্তির উপর আরঙ্গজীবের উচ্চ মসজেদ্‌চূড়া তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে।

আরঙ্গজীব ধর্মান্ধ হইয়া যে সকল মর্ম্মপীড়ায় হিন্দুহৃদয় দলিত করিয়াছিলেন, লোকে তাহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি যে উপায়ে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সেই সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য অসিহস্তে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনের জন্য তাঁহার কলঙ্ক-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। বৃদ্ধ পিতা সাহজাহানকে নিরপরাধে অন্যায়-কৌশলে আগ্রা দুর্গের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃসন্তানদিগের তপ্তশোণিতে সন্তরণ করিতে করিতে বাদশাহ আরঙ্গজীব ভারতবর্ষের স্বর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ভাল করিয়া সেই সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতেই পিতৃদ্রোহের জীবন্ত অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। যে সিংহাসনে প্রজাবৎসল আকবর বাদশাহ উপবেশন করিয়া হিন্দু মুসলমানকে প্রীতিবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, কর্মদোষে সেই সিংহাসনে বসিয়া একদিনের জন্যও আরঙ্গজীব নিরুদ্বেগ হইতে পারেন নাই।

পৃথিবীতে কাহাকেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং কপটতাই তাঁহার কূটনীতির মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়ের অবিশ্বাস লুকাইয়া রাখিয়া মুখের সরলতা দেখাইতে কখনই তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই; কিন্তু এত করিয়াও মোগলের অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারিলেন

না। যে রাজপুত-বীরগণ অসি-হস্তে দেশ বিদেশে মোগলের বিজয়-পতাকা বহন করিতেছিলেন, তাঁহারাও একে একে গোপনে গোপনে শত্রু হইতে আরম্ভ করিলেন; যে মুসলমান অমাত্যগণ ছায়ার ন্যায় নিয়ত সম্রাটের অনুবর্তন করিতেন, তাঁহারাও সুযোগ বুঝিয়া একে একে বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিলেন; একদিন যে মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ "পার্বত্য মূষিক" নামে ঘৃণার সহিত উপহসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ছলের পরিবর্তে ছল, কৌশলের পরিবর্তে কৌশল প্রয়োগ করিয়া, আরঙ্গজীবের সকল চেষ্টা বিফল করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যে পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য-সংস্থাপনের সূত্রপাত হইল; দেশের পর দেশ মহারাষ্ট্র সেনার লুণ্ঠন-যাতনায় বিপর্যস্ত হইতে লাগিল; সম্রাটপুত্রগণ পিতার অসাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া তাঁহার জীবনকালেই সিংহাসনলাভের জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন; দাক্ষিণাত্য ও অযোধ্যার মুসলমান রাজপ্রতিনিধি-গণ স্বাধীনরাজ্যসংস্থাপনের আয়োজন করিতে লাগিলেন;—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরঙ্গজীব চাহিয়া দেখিলেন যে, চারিদিকেই পিতৃশাপের জ্বলন্তশিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়াছে, পদতলে মোগলের অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছে, জরাপলিত দুর্বল মুষ্টি হইতে ভারত-বর্ষের শাসনদণ্ড খসিয়া পড়িতে চাহিতেছে!

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলাদেশেও সেই অধঃপতনের পূর্বসূচনা আরব্ধ হইয়াছিল। যিনিই বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনভার প্রাপ্ত হন, তিনিই ছলে বলে কৌশলে স্বাধীন হইবার আয়োজন করেন; কখন বহুব্যয়ে ও সৈন্যক্ষয়ে বাঙ্গলাদেশ পদানত করিতে হয়, কখন বা অন্যান্য প্রদেশের রাজকোষ হইতে অর্থভিক্ষা করিয়া বাঙ্গলাদেশের অভাবমোচন করিতে হয়। বাঙ্গলার এই সকল দুর্দশা দেখিয়া, আরঙ্গজীব এক নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিলেন। একজন মাত্র নবাবের হস্তে সৈন্যবল ও ধনবল থাকাতেই পদে পদে বিপদ উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি বাঙ্গলাদেশের জন্য দুইজন নবাব নিযুক্ত করিলেন। একজন "নবাব

নাজিম"[৫] হইয়া সৈন্যবলে দেশরক্ষা ও রাজদণ্ডে প্রজাশাসন করিবেন, এবং আর একজন "নবাব দেওয়ান"[৬] হইয়া রাজকর সংগ্রহ করিয়া, উভয় নবাবের আবশ্যক ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া দিবেন। এই কৌশলনীতি অবলম্বন করিয়া আরঙ্গজীব আপন পৌত্র আজিমশ্মানকে "নবাব নাজিম" ও আপন বিশ্বস্ত অনুচর মুর্শিদ কুলীখাঁকে "নবাব দেওয়ান" করিয়া, ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলাদেশে পাঠাইয়া দিলেন।[৭] এই উভয় নবাব ঢাকা নগরের রাজধানীতে থাকিয়া বাঙ্গলাদেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুলীখাঁ ব্রাহ্মণ-সন্তান; অতি অল্পবয়সে এক ধনাঢ্য মুসলমান তাঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ও পারসী আরবী ভাষায় সুশিক্ষিত করেন। ইসলাম ধর্মে কুলীখাঁর ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রতিভা ও শিক্ষার বলে বাদশাহের নিকট কর্মকুশল বীরপুরুষ বলিয়াই সমধিক পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকাল রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া কুলীখাঁ যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেই বাদশাহ তাঁহাকে নবাব-দেওয়ান করিয়াছিলেন। মুসলমান হইলেও হিন্দুর প্রতি তাঁহার প্রাণের মধ্যে অজ্ঞাতসারে যে সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত হইত, তাহা কোনদিনই বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা প্রতিভা ও কার্যতৎপরতার সমধিক সম্মান করিতেন, সুতরাং তাঁহার শাসনসময়ে প্রতিভাশালী কার্যকুশল হিন্দুদিগের পক্ষে পদোন্নতিলাভ করার কোনরূপ বাধা বা অসুবিধা ছিল না।

কুলীখাঁ বাঙ্গলাদেশে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রাজকোষের শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ বুঝিতে পারিলেন। দিল্লীর দরবারের প্রিয়পাত্র মুসলমান অমাত্য ও সেনাপতিগণ বাদশাহদিগের মনস্তুষ্টি করিয়া সময়ে সময়ে বহুতর নিষ্কর "জায়গীর"[৮] পুরস্কার পাইতেন। তাঁহারা বাদশাহের মন্ত্রিসভার সহায়তায় বাঙ্গলাদেশের উর্বর ভূমিগুলি জায়গীর লইতে পারিলে অন্য প্রদেশে জায়গীর লইতে স্বীকৃত হইতেন

না। এইরূপে বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ স্থানই জায়গীরদারদিগের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশিষ্ট স্থানে যে সকল হিন্দু জমিদার বাস করিতেন, তাঁহারা প্রায়ই রাজকর দিতেন না; এবং সুযোগ বুঝিলে দিল্লীর অধীনতা পর্যন্তও অস্বীকার করিতেন। কুলীখাঁ সম্রাটের অনুমতি লইয়া মুসলমান জায়গীরদারদিগকে উড়িষ্যার পার্বত্যপ্রদেশে জায়গীর নির্দেশ করিয়া দিয়া বাঙ্গলার সমুদায় স্থান "সকর" করিয়া লইলেন, এবং প্রথম বৎসরেই বাদশাহের নিকট এক কোটি টাকা রাজকর পাঠাইয়া আরঙ্গজীবের সবিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গলার জমিদারদিগের পক্ষ হইতে হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য নবাব-দরবারে এক একজন মোক্তার রাখিবার নিয়ম ছিল। তাঁহারা নবাব-দরবারে নিজ নিজ প্রভুর পক্ষে প্রতিনিধি-স্বরূপ সকল কার্যই সম্পাদন করিতেন। ইংরাজদিগের সমসাময়িক কার্যবিবরণীতে লিখিত আছে যে, প্রধান প্রধান জমিদারগণ আপন পদমর্যাদার অনুরূপ এক একজন মোক্তার রাখিয়া রাজধানীর সহিত চিঠিপত্র চালাইতেন।*

এই সকল মোক্তারদিগের বিদ্যাবুদ্ধি এবং কার্যতৎপরতার উপরেই বাঙ্গলার জমিদারদিগের মানসম্ভ্রম ও জমিদারী নির্ভর করিত; সুতরাং যাঁহারা স্বয়ং নবাব-দরবারে বাস করিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিজ কর্মচারীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেই মোক্তারী পদে

* "It was the custom for the landholders of distinction and other principal inhabitants to maintain in proportion to their rank an intercourse with the ruling power, and in person or by Vakeel or agent to be in constant attendance at the seat of Government.—*Fifth Report from the Select Committee of the House of Commans on the East India Company, 1812.* Edited with an Introduction by W. K. Firminger, 3 vols., Calcutta, 1917.

নিযুক্ত করিতেন। এই কার্যে সর্বদা প্রত্যুৎপন্নমতির প্রয়োজন হইত; পারস্য ভাষায়, মুসলমান ও হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে এবং হিসাব-নিকাশের কূট প্রশ্নাদির মীমাংসা-কার্যে সমধিক অভিজ্ঞতা না থাকিলে কেহ এই কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। মোক্তারগণ ঢাকায় বাস করিয়া কাননগো[৯] দপ্তরে হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিতেন। এই কার্যে দুইজন কাননগো নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা নবাব-দেওয়ানের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিয়া মোহর দস্তখত করিয়া দিলে তবে তাহা বাদশাহ গ্রহণ করিতেন; সুতরাং নবাবগণ তাঁহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিয়া চলিতেন।

মুর্শিদ কুলীখাঁ নবাব হইয়া আসিলে পুঁঠিয়ার রাজার পক্ষ হইতে ঢাকায় একজন মোক্তার নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। রঘুনন্দনের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভা দেখিয়া পুঁঠিয়ার রাজা তাঁহাকেই এই কার্যে নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় পাঠাইলেন। ইহাই নাটোর রাজবংশের ভবিষ্যৎ রাজ্য লাভের প্রথম সোপান। শুনা যায় যে, রঘুনন্দন এমন সহজে ও সুকৌশলে হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করিবার এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, কাননগো-দপ্তরে শীঘ্রই তিনি "নায়েব-কাননগো" পদে নিযুক্ত হইলেন।

প্রকৃত প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যে কার্যেই নিযুক্ত হউন না কেন, যখন তাঁহাদের প্রতিভা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তাঁহারাই সেই কার্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। যিনি প্রভু তিনিও নিজের বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা প্রতিভাশালী অধীনস্থ কর্মচারীর বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কারণে অতি অল্পদিনের মধ্যে রঘুনন্দনের উপরেই সকল ভার ন্যস্ত হইয়া পড়িল; তিনি নায়েব-কাননগো হইলেও কাননগো-দপ্তরে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। এই কার্যে মানসম্ভ্রম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রঘুনন্দনের অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইল। তিনি ক্রমে নবাব-দরবারের একজন ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারী

হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ঢাকার নবাবদিগের মধ্যে এক অভাবনীয় বিবাদের সূত্রপাত হওয়াতে রঘুনন্দনের ক্ষমতা চরমসীমায় আরোহণ করিল।

কুলীখাঁর ন্যায় একজন হিন্দু ক্রীতদাসকে সামান্য সৈনিক-পদবী হইতে নবাব-দেওয়ানের উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া আরঙ্গজীব কখনও অনুতাপ করেন নাই, বরং বর্ষে বর্ষে বহু লক্ষ টাকা রাজকর পাইয়া তাঁহার উপর ক্রমেই বিশ্বাস স্থাপন করিতেছিলেন। কিন্তু সম্রাট-পৌত্র আজিমশ্মান্ একজন নগণ্য সৈনিককে সহকারী নবাবের উচ্চপদে আরোহণ করিতে দেখিয়া প্রথমে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; ক্রমে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে দেখিয়া বিরক্তি ঈর্ষায় পরিণত হইতে লাগিল। মনের ভাব অধিক দিন গোপন রহিল না। প্রথমে একটু মনোমালিন্য, ক্রমে বাদানুবাদ, অবশেষে প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ হইল। আজিমশ্মান্ গোপনে কুলীখাঁকে হত্যা করিবার আয়োজন করিলেন। সেই চক্রান্ত শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল; ক্রমে বাদশাহের নিকট সে সংবাদ প্রেরিত হইল। আরঙ্গজীব আজিমশ্মান্‌কে পাটনায় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া, মুর্শিদ কুলীখাঁর হিসাব-নিকাশ তলব করিয়া পাঠাইলেন।

কুলীখাঁ হিসাব-নিকাশ লইয়া স্বয়ং সম্রাটের নিকট গিয়া আনুপূর্বিক সমুদায় অবস্থা বলিবার অবসর পাইবেন, এই চিন্তায় আজিমশ্মানের মুখ শুকাইয়া গেল; কিসে মুর্শিদ কুলীখাঁর যাওয়া রহিত হইতে পারে, সেই চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল। অবশেষে আজিমশ্মান্ স্থির করিলেন যে, যদি কাননগোদ্বয় নবাব-দেওয়ানের হিসাবে মোহর দস্তখত না করেন, তাহা হইলেই সকল দিক রক্ষা হয়। তিনি কাননগোদিগকে শাসন করিয়া দিলেন। আজিমশ্মান্ সম্রাটের পৌত্র, কালে তিনি বাদশাহ হইলেও হইতে পারেন; আর মুর্শিদ কুলীখাঁ আজ আছেন, কাল নাই; সুতরাং আজিমশ্মানের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কুলীখাঁর হিসাব-নিকাশের কাগজে মোহর দস্তখত করা কাননগোদিগের সাহসে কুলাইল

না। মুর্শিদ কুলীখাঁর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; যদি একজন কাননগোও মোহর দস্তখত না করেন, তবে সে কাগজে বাদশাহ দৃষ্টিপাত করিবেন না, এবং নিতান্ত অপদস্থ হইয়া তাঁহাকে নবাবীপদ ত্যাগ করিতে হইবে, এই চিন্তায় কুলীখাঁ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া নায়েব-কাননগো রঘুনন্দনের শরণাগত হইলেন।

রঘুনন্দনের চেষ্টায় একজন মাত্র কাননগোর মোহর-দস্তখতযুক্ত হিসাব ও বহুতর উপঢৌকনদ্রব্য লইয়া কুলীখাঁ সম্রাটের নিকট গমন করিলেন। সম্রাট তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধক্ষেত্রে, অর্থের তখন বড়ই অনটন; কুলীখাঁও বহুতর অর্থ লইয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান; সুতরাং দুইজন কাননগো কেন মোহর দস্তখত করেন নাই, সে কথা জিজ্ঞাসার সময় হইয়া উঠিল না। বাদশাহ উপঢৌকনদ্রব্য ও রাজকর গ্রহণ করিয়া রাজপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ মূল্যবান্ রাজপরিচ্ছদ "খেলাত" দিয়া, কুলীখাঁকেই বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার একমাত্র নবাব করিয়া পাঠাইলেন। কুলীখাঁ আসিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং উপকারী বন্ধু রঘুনন্দনকে আনাইয়া তাঁহাকে রায়রাইয়ান ও দেওয়ান করিলেন। সেই হইতে প্রতিভার সঙ্গে ক্ষমতা আসিয়া মিলিত হইল,—তাহাই নাটোররাজবংশের রাজ্যলাভের মূলকারণ।

তৎকালের দেওয়ানই প্রকৃত প্রস্তাবে নবাব ছিলেন, এবং তজ্জন্য দেওয়ানী-পদের মানসম্ভ্রম ও ক্ষমতা বড়ই অধিক ছিল। লোকে সহসা নবাবদরবারে গমন করিতে পারিত না, সুতরাং অর্থী, প্রত্যর্থী, রাজা, জমিদার, সকলেই দেওয়ানের দরবারে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহার শুভদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিবিধ উপঢৌকনদ্রব্য "নজর" প্রদান করিতেন। রঘুনন্দন দেওয়ানীপদে আরোহণ করিয়া এই সকল মানসম্ভ্রম এবং উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন।

এই ঘটনার বর্ণনা করিতে গিয়া অধিকাংশ লেখকই বলিয়া গিয়াছেন যে, কাননগোর মোহর রঘুনন্দনের নিকটেই থাকিত, তিনি কাননগোর অজ্ঞাতসারে গোপনে সেই মোহর লইয়া নবাবের কৃত্রিম

আয় ব্যয়ের, কাগজে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ রায়-রাইয়ান ও দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হন।*

রঘুনন্দনের নবাব-দরবারে প্রভুত্ব ছিল, এবং সেই প্রভুত্বই যে রামজীবনের রাজ্যলাভের মূলকারণ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রভুত্বের মূল কি? ঢাকার ইতিহাসলেখক বিনা প্রমাণে রঘুনন্দনকে জালিয়াতি অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন। বাস্তবিক মুর্শিদ কুলীখাঁ জাল হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জাল হিসাব প্রস্তুত করিবার আদৌ কোন কারণ ছিল না। বাঙ্গলাদেশে কত টাকা আয় হয়, কত টাকা ব্যয় হয়, বাদশাহেরা তাহার তত্ত্ব লইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না। রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গলাদেশের যে রাজস্বনির্ণয় করেন, তাহাতে বার্ষিক এক কোটী টাকা বাদশাহের প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সেই এক কোটী টাকা কোন বৎসরেই আদায় হইত

*"Raghunandana was originally employed as an apprentice or clerk in the canongoe's office. The Nawab, on one occasion, being desirous of submitting false returns of his revenue collections before the Mogal Emperor, was of course obliged to tamper with the canongoe's papers; for some reason he does not appear to have been able to effect his purpose through the canongoe himself; but he had recourse to this apprentice Raghunandana; that person entered into the plot, and having abstracted the canongoe's seal was enabled to draw up fictitious papers for his employer duly stamped and seeald. As a reward for this service, Raghunandana appears to have been favoured at the court of Moorshidabad and to have exercised considerable influence and it was through his good offices that Ramjiban succeeded in being nominated to the zamindary of Rajshahy." E. M. Lewis, *History and Statistics of the Dacca Division*, p. 20.

না। মুর্শিদ কুলীখাঁ বাঙ্গলাদেশে আসিয়া প্রথম হইতেই এক কোটী টাকা রাজকর প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং কৃত্রিম হিসাব-নিকাশ প্রস্তুত করিবার আদৌ কোন আবশ্যকতা ছিল না। সেই হিসাবে প্রকাশ্যভাবে কাননগো দস্তখত মোহর করিতে স্বীকার না করার কারণ কি, ঢাকার ইতিহাসলেখক তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। স্বতরাং কতকগুলি আনুমানিক প্রস্তাবের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় নাই।

সম্রাট মুর্শিদ কুলীখাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন; বরং তাঁহার উপর এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, আপন পৌত্রকেও তাঁহার জন্য পাটনায় স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সেই সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ সম্রাট কুলীখাঁকে বাঙ্গলার নবাবদেওয়ান করিয়াছিলেন। কুলীখাঁ প্রথম বৎসর হইতেই এক কোটী টাকা হিসাবে রাজকর প্রদান করায় সম্রাটের আহ্লাদের সীমা ছিল না। এই সকল কথা জনশ্রুতি নহে,—ঐতিহাসিক সত্য। যদি আজিমশ্বানের সঙ্গে বিবাদ না হইত, তবে যে কাননগো মোহর দস্তখতে অস্বীকার করিতেন না, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। কাননগোর তখন উভয় সঙ্কটের অবস্থা;—আজিমশ্বানের অনুরোধ অবহেলা করাও যেমন নিরাপদ নহে, কুলীখাঁর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত না করাও সেইরূপ সহজ নহে; এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কাননগো গোপনে কুলীখাঁর অনুরোধ রক্ষা করিয়া, প্রকাশ্যে আজিমশ্বানের নিকট তাহা অস্বীকার করিয়া, উভয় নবাবের নিকটেই "সরফরাজ" থাকিবার জন্য যে চেষ্টা করেন নাই, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে বাঙ্গলাদেশ রীতিমত শাসন করিতে শৈথিল্য করায় বাদশাহ নবাবের উপর অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই রাজরোষ পরিহারের জন্য নবাব আয় ব্যয়ের এক কৃত্রিম হিসাব প্রস্তুত করাইয়া কাননগোকে তাহাতে মোহর দস্তখত করিতে অনুরোধ করেন; কাননগো অস্বীকার করায় নবাব রঘুনন্দনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। নবাবের অনুগ্রহলাভের এরূপ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া রঘুনন্দন সে প্রবল লোভ সম্বরণ করিতে

পারিলেন না,—নবাব যাহা বলিলেন, তিনি তাহাই করিলেন।"* কিশোরীবাবু রঘুনন্দনের মস্তকে কলঙ্কভার অর্পণ করিবার সময়ে যদি অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিয়া দেখিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন যে, "এই সময়ে বাঙ্গলাদেশ রীতিমত শাসন করিতে শৈথিল্য করায় বাদশাহ নবাবের উপর অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন"—এই কথাগুলির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। শাসনভার আজিমশ্মানের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহার জন্য বাদশাহ কুলীখাঁর উপর অসন্তুষ্ট হইবেন কেন; এবং তাহার জন্য কুলীখাঁ কৃত্রিম হিসাবই বা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইবেন কেন?

তৎকালে রঘুনন্দনের ন্যায় আর কেহ ব্যবস্থাশাস্ত্রবিশারদ ও অর্থ-নীতিকুশল রাজকর্মচারী ছিল না; সুতরাং বাঙ্গলাদেশের রাজস্বনির্ণয়-কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে, কুলীখাঁর ন্যায় প্রতিভাশালী নবাব যে রঘুনন্দনকেই দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কথা নাই। কেবলমাত্র প্রত্যুপকার করিবার জন্য যে নবাব তাঁহাকে দেওয়ানী-পদে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। একালের বড়লোকেরাও যাহাকে ধরিয়া বড়লোক বলিয়া পরিচিত হন, তাহার কথা অল্পই স্মরণ করিয়া রাখেন; মুর্শিদ কুলীখাঁ সেকালের স্বাধীন নবাব হইয়া যে কেবলমাত্র উপকারী বন্ধু বলিয়াই রঘুনন্দনকে দেওয়ান করিয়াছিলেন, এবং রঘুনন্দন যে "জালিয়াতি" করিয়া তাহারই বিনিময়ে সেই উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে ঐতিহাসিক প্রমাণ আবশ্যক;—কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া রঘুনন্দনের উজ্জ্বল প্রতিভায় কলঙ্ক আরোপ করা সঙ্গত নহে।

* *The Rajas of Rajshahi*, Kishori Chand Mitra, *Calcutta Review*, vol. LVI.

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. 'প্রদেশ' কথাটি এখানে বিভাগ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

২. In 1728 the zamindary of Rajshahi extended from Bhagalpur on the west to Dacca on the east, and included a large subdivison called Nij Chakla Rajshahi, on the south bank of the Padma, which stretched across Murshidabad and Nadia as far as the frontiers of Birbhum and Burdwan. Rajshahi thus comprised an area of 13,000 square miles, and paid a revenue of 27 lakhs.—*The Imperial Gazetteer of India*. Vol XXI, 1908, p. 162.

৩. "আদিশূরই বাংলায় প্রথম ব্রাহ্মণ আনিলেন, তাঁহার আগে ব্রাহ্মণ ছিল না, বেদের চর্চা ছিল না, কুলজী গ্রন্থগুলির এই তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক অথচ ইহারই উপর সমস্ত কুলজী-কাহিনীর নির্ভর।" নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, ১৩৫৯, পৃঃ ২৬৪।

৪. নাটোর রাজবংশের বংশতালিকা :
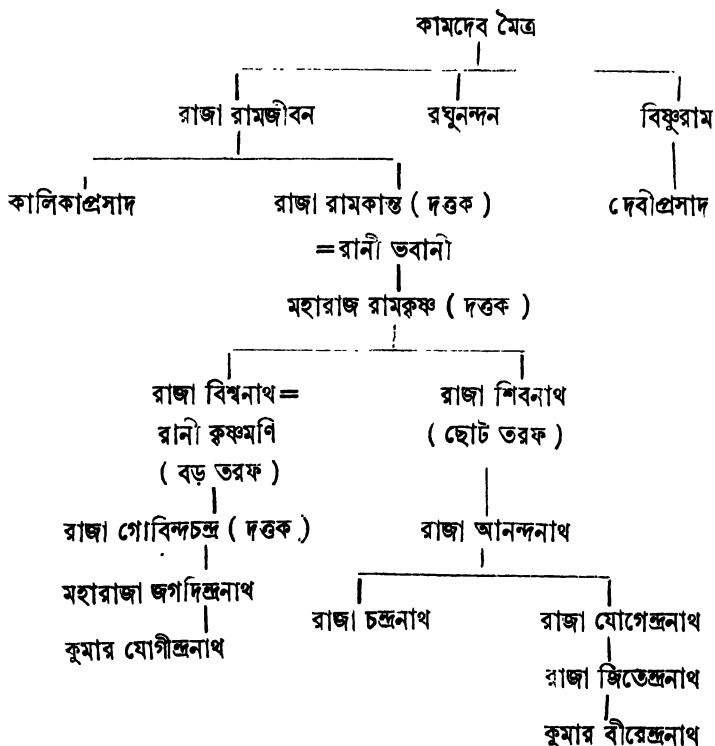
৫. Naib Nazim : "Deputy Governor and administrator of Justice". Also "an officer nominally under the Nawab of Bengal but appointed by British authority to superintend the administration of criminal justice." Glossary quoted in K. K. Datta, *Shah Alam II and the E. I. Company,* Calcutta, 1965, p. 141.

৬. Naib Dewan : "Under the Mohammedan Governments ...the head financial minister, whether of the State or a province...charged, in the latter, with the collection of the revenue, the remittance of it to the imperial treasury, and invested with extensive jujdical power in all civil and financial causes."—H.H. Wilson's *Glossary of Judicial and Revenue Terms* (1855) quoted in Hobson Jobson, 1902, p. 309.

৭. ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর মুর্শিদকুলী খাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজীবের নিকট হইতে বাংলার দেওয়ান এবং মকসুদাবাদের ফৌজদার হিসেবে নিয়োগপত্র পান। J. N. Sarkar Ed. *History of Bengal,* Vol II, Dacca, 1948, p. 309.

৮. *Jagir*, an assignment of the Government share of the produce of a portion of land to an individual, generally for military services, "for the support of any public establishment, particularly of a military nature". Quoted in Glossary. K K Datta, *Ibid* p. 140.

৯. Under Todor Mal "the office of the Qanungo became the hinge of land revenue administration. The quanungoes and their deputies became fixed agents of the Government... who interpreted the revenue constitution". —N. K. Sinha, *Economic History of Bengal,* vol. II, p. 1.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজ্যলাভ

দিল্লীর বাদশাহেরা অনেকবার বাঙ্গলাদেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু একবারও দীর্ঘকাল রীতিমত রাজকর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার জমিদারগণ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই স্বেচ্ছায় রাজকর প্রদান করিতেন না, বরং অবসর ও সুযোগ পাইলে সকলেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন। যাঁহারা নামে দিল্লীর অধীন, তাঁহারাও কার্যতঃ আপন আপন জমিদারীতে স্বাধীন ভূপতির ন্যায় রাজশক্তি পরিচালন করিতেন। সেই জন্য বঙ্গদেশ অনেকগুলি ছোট ছোট স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ;—সেই সকল ছোট ছোট স্বতন্ত্ররাজ্যের কলহ বিবাদে দেশের সুখশান্তি সর্বদাই বিপর্যস্ত হইত।

মানসিংহ তরবারি হস্তে বাঙ্গলাদেশ জয় করিয়া সম্রাট আকবর শাহের একচ্ছত্র শাসন সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজা টোডরমল্ল বাঙ্গলাদেশ বাহুবলে পরাজিত করিয়া বুদ্ধিকৌশলে তাহার রাজস্ব নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। টোডরমল্ল যুদ্ধব্যবসায়ী রাজপুত বীর হইয়াও মসীজীবী রাজকর্মচারীর মত অনবরত রাজস্বসংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া এরূপ নিপুণভাবে কার্য সম্পাদন করিলেন যে, তাঁহার বীরত্ব-কীর্তি ভুলিয়া গিয়া লোকে এখন পর্যন্ত তাঁহার রাজস্বনীতির আলোচনা করিয়া থাকে। তিনি বাঙ্গলাদেশ ১৯ সরকারে ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া বার্ষিক ১০৬৯৩২৫৩ টাকা রাজস্বনির্ণয় করিয়া দেন।* তাঁহার নির্দেশক্রমে বাঙ্গলাদেশে জিন্নতাবাদ (গৌড়), পূর্ণিয়া, তেজপুর, পিঞ্জারা (দিনাজপুর), ঘোড়াঘাট (রঙ্গপুর) বারবাকাবাদ,

* আইন-ই-আকবরি

বাজুহা, শ্রীহট্ট, সুবর্ণগ্রাম, ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম, আকবরনগর (ঢাকা), সেরিফাবাদ, সেলিমাবাদ, মাদারণ, সপ্তগ্রাম, মহম্মদাবাদ (ভূষণা), খলিফিতাবাদ (যশোহর) ও বাক্‌লা নামে ১৯টি সরকার নির্দিষ্ট হয়, এবং প্রত্যেক সরকারের অধীনে যতগুলি পরগণা ও যে পরিমাণ রাজস্ব, তাহাও লিপিবদ্ধ হয়।* কাগজপত্রের যেরূপ কড়াক্কড়, খাজানা আদায়ে সেরূপ কড়াক্কড় ছিল না; অল্পদিনের মধ্যেই অনেক জমিদার খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং "খাল্‌সা"[১] অপেক্ষা "জায়গীরেরই" অধিক শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল।

মুর্শিদ কুলীখাঁ সর্বময় কর্তা হইয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপন করিবার সময়[২] হইতেই রাজস্বনির্ধারণকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই কার্যে রায় রাইয়ান্[৩] রঘুনন্দন তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। রাজস্বনির্ধারণ করিতে হইলে যেরূপ অধ্যবসায় এবং প্রতিভা থাকা আবশ্যক, রঘুনন্দনে তাহার অভাব ছিল না; তিনি টোডরমল্লের প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে সকর ও জায়গীর ভূমির করধার্যে অগ্রসর হইলেন। যথাসময়ে রাজস্বসংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক সরকারে এক এক জন "ফৌজদার" রাখিবার নিয়ম ছিল; ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য রঘুনন্দন কেবলমাত্র ১৩ জন "ফৌজদার" রাখিবার কল্পনা করিয়া সমুদায় দেশ ১৩টি চাক্‌লায় বিভক্ত করিলেন, এবং সেই সকল চাক্‌লা ১৬৬০ পরগণায় বিভাগ করিয়া তাহার রাজস্বনির্ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে উড়িষ্যায় দুই চাক্‌লা ও বাঙ্গলাদেশে সপ্তগ্রাম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ভূষণা, আকবরনগর, ঘোড়াঘাট, কড়াইবাড়ী, জাহাঙ্গীরনগর, শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদ নামে একাদশ

* James Grant's *Analysis of the Finance of Bengal in Fifth Report*, Appendix IV.

চাক্‌লা নির্দিষ্ট হইল।*

এই সকল পরগণাগুলির রাজস্ব আদায়ের ভার জমিদারদিগের হস্তে পূর্ব্ববৎ ন্যস্ত হইল। ইহা ব্যতীত নবাব বাহাদুরের পরিবারপালনের জন্য ১০৭০৪৬৫ টাকা আয়ের ৬০ পরগণা, আমীরুল ওমরা বক্সী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির জন্য ২২৫০০০ টাকা আয়ের ১৮ পরগণা, ফৌজদারদিগের জন্য ৮৯২৮০০ টাকা আয়ের ৭৫ পরগণা, সীমান্তরক্ষক মন্‌সবদারদিগের জন্য ১১০৮৫২ টাকা আয়ের ২০ পরগণা, ত্রিপুরা সুসঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্যপ্রদেশ রক্ষার জন্য ৪৯৭৫০ টাকা আয়ের ২ পরগণা, মৌলবী পোষণের জন্য ২৫৬৬৫ টাকা আয়ের ২ পরগণা, নৌয়ারা অর্থাৎ নৌসেনার জন্য ঢাকা প্রদেশে ৯২৩ জন পর্তুগীজ নাবিক ও ৭৬৮ খানি রণতরী রাখিবার জন্য ৭৮৯৫৪ টাকা আয়ের ৫৫ পরগণা, আসাম প্রদেশের পার্ব্বতীয়দিগের উৎপাত নিবারণ জন্য ৩৫৯১৮০ টাকা আয়ের ১৩৮ পরগণা নির্দ্দিষ্ট হইল।*

সুবা	চাক্‌লা	পরগণা	রাজস্ব
উড়িষ্যা	বালেশ্বর	১৭	১০৮৮৭৬
"	হিজ্‌লী	৩৫	৪১৮৫৮৯
বাঙ্গলা	মুর্শিদাবাদ	১১৮	২৯৯৯১২৬
"	বর্দ্ধমান	৬১	২২৪৪৮১২
"	সপ্তগ্রাম	১১৩	১৫৩৯০০৩
"	ভূষণা	১১৫	৬৭৮৫৭৮
"	যশোহর	৭৯	৩৫৩২৬৬
"	আকবরনগর	১১৮	৯২৬২৬৬
"	ঘোড়াঘাট	৪৫১	২১৮০৪১৫
"	কড়াইবাড়ী	২৫	২০২৭০৫
"	জাহাঙ্গীরনগর	২৩৬	১৯২৮২৯৪
"	শ্রীহট্ট	১৪৮	৫৩১৪৫৫
"	ইসলামাবাদ	১৪৪	১৭৬৭৯৫
		১৬৬০	১৪২৮৮১৮০

* James Grant's *Analysis etc.*

রাজস্ব-নির্ধারণকার্য যেরূপ কৌশল ও যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল, রাজস্বসংগ্রহের কার্যও সেইরূপ দৃঢ়তা ও কঠোরতার সহিত নির্বাহিত হইতে লাগিল, রঘুনন্দন বুদ্ধিবলে যে রাজস্ব নির্ধারণ করিয়া দিলেন, নবাবের দৌহিত্রীপতি সৈয়দ রেজা খাঁ বাহুবলে তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাকে সেকালের লোকে মহম্মদ বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল। রঘুনন্দনের নাম অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মহম্মদের নাম এখনও অনেক প্রাচীন জমিদারবংশের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে! তাহার মত নির্মম-হৃদয়ে করসংগ্রহ করিতে ও আবশ্যকমত উৎপীড়নের নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে আর কেহ জানিত কি না সন্দেহ। সে প্রথমে অনুচর পাঠাইয়া রাজকর চাহিত, তৎক্ষণাৎ দিতে না পারিলে জমিদারকে মুর্শিদাবাদে ধরিয়া আনিত; সেখানে মহম্মদের কুটিল কল্পনা "বৈকুণ্ঠ"* নামে এক নরকহ্রদ খনন করাইয়া যাবতীয় পূতিগন্ধময় অপবিত্র পদার্থে তাহা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।[8] রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হইলে, অথবা শিথিলতাপ্রদর্শন করিলে, জমিদারদিগকে সেই নরকহ্রদে ফেলিয়া মহম্মদের অনুচরগণ নির্মমহৃদয়ে পীড়ন করিত, এবং আবশ্যক হইলে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া বিদ্রোহী অথবা অশক্ত জমিদারের ভিটামাটি উৎসন্ন করিয়া আসিত।† মহম্মদের সুব্যবস্থায় দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল!

* 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' ও 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' নামক পারস্য গ্রন্থে 'বৈকুণ্ঠের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতেই যথাক্রমে গ্লাডউইন, স্কট এবং গ্রাণ্ট এই কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' সংকলন করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'বর্তমান কেল্লার দক্ষিণ তোরণদ্বারের সম্মুখে' ইহার স্থাননির্দেশও হইয়া থাকে। মুর্শিদ কুলীখাঁর জীবনচরিত সংগ্রহ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক অনুসন্ধান করিতেছেন; তিনি বলেন, 'বৈকুণ্ঠের' কথা সর্বৈব মিথ্যা! রাজসাহী প্রদেশে কিন্তু ইহার জনশ্রুতি এখনও প্রবল!

† **Stewart, *History of Bengal.***

দুর্বল জমিদারগণ বাড়ীঘর ফেলিয়া পলায়নপর হইলেন, কেহ কেহ মহম্মদের নিমন্ত্রণে রাজধানীতে আসিয়া "বৈকুণ্ঠবাস" করিতে লাগিলেন।* কাহারও কাহারও হাস্যময় রাজপুরী বিজনবনে পরিণত হইতে লাগিল! যথাসময়ে নির্দিষ্ট রাজকর সংগ্রহ করা এবং বৈশাখমাসে তাহা সম্রাট-সদনে প্রেরণ করাই নবাবের একমাত্র উদ্দেশ্য,—সে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য প্রাচীন জমিদারগণকে পৈতৃক বাস্তুভিটা হইতে চিরনির্বাসিত করিতে কেহই ইতস্ততঃ করিল না, নবাবও তাঁহাদের করুণক্রন্দনে কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং অতি অল্পদিনের মধ্যেই মৃত, পলায়িত বা নির্বাসিত জমিদারদিগের প্রাচীন জমিদারীর রাজস্বসংগ্রহের জন্য নূতন নূতন জমিদার সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া উঠিল;—ইহাই নাটোর-রাজবংশের রাজ্যলাভের ঐতিহাসিক মূলসূত্র।

দেওয়ানখানা হইতে যখন নূতন জমিদারী-বন্দোবস্তের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইতে লাগিল, মহম্মদের ভয়ে তখন অল্প লোকেই সাহস করিয়া জমিদারী লইবার জন্য আবেদন করিল। দেওয়ান রঘুনন্দন তখন নবাবের প্রিয় সহচর এবং প্রধান পরামর্শদাতা। তিনি প্রতিভা ও বুদ্ধিকৌশলে যে রাজস্বের হার নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা নিরুদ্বেগে আদায় করিবার জন্য আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে নূতন জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। রামজীবন বাহুবলে প্রবল পরাক্রমে রাজস্বসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই নবাবের প্রিয় জমিদার বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। তখন বিনা চেষ্টাতেও অনেক জমিদারী রামজীবনের হস্তগত হইতে লাগিল।

রামজীবন পরগণা লস্করপুরের অধিপতি পুঁঠিয়ার রাজাদিগের অধীনে তরফ কানাইখালির অন্তর্গত নাটোরে রাজবাটী নির্মাণ করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন, এবং নবাবের অনুকম্পায় দিল্লী হইতে ২২ খান "খেলাত" ও রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়া ১৭০৬ খৃষ্টাব্দ

* *Sir John Shore's Minute*—**Fifth Report, Vol I.**

হইতে নাটোরের রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন।* এতদিনের পর রঘুনন্দনের প্রতিভা ও পদগৌরবের সঙ্গে ঐশ্বর্য ও রাজশক্তি মিলিত হইল;—অতি অল্পদিনের মধ্যে নাটোর রাজবংশের এরূপ রাজ্যোন্নতি হইতে লাগিল যে, তাহা "রঘুনন্দনী বাড়" অর্থাৎ রঘুনন্দনের পদবৃদ্ধি বলিয়া বাঙ্গলাদেশের প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া উঠিল।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দের সমকালে পরগণা বাণগাছি বিখ্যাত জমিদার গণেশরাম চৌধুরীর অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি যথাসময়ে রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রামজীবনকে বাণগাছির জমিদারী প্রদান করা হয়। ইহাই প্রথম রাজ্যলাভ।

আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সম্মিলনস্থানের নিকটে সান্তোল রাজ্যের একটি পুরাতন রাজধানী ছিল। একদিন যেখানে বিপুল রাজপুরীর ঐশ্বর্য-কোলাহলে অট্টালিকা-বেষ্টিত রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইত, আজ সেখানে শৃগাল-রোদনে বনভূমি পরিপূরিত হইতেছে; কোথাও বা দুই চারি জন অন্নহীন মলিনমুখ কাঙ্গাল কৃষক নিভৃতে হলচালনা করিতেছে! একটি জরাজীর্ণ পুরাতন দেবমন্দির ভিন্ন সে রাজপুরীর আর কোনও চিহ্নই বর্তমান নাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রামকৃষ্ণ নামক একজন ব্রাহ্মণ জমিদার সান্তোলের রাজা। তপ্পে ভাতুড়িয়া ও তদন্তর্গত ২৪১৩৯৭ টাকা বার্ষিক রাজস্বের ১৩ পরগণায় তাঁহার জমিদারী ছিল।** নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা রঘুরাম রায় ও সান্তোলাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণই সে সময়ে বিদ্যোৎসাহ ও পুণ্যকীর্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নদীয়ার ন্যায় সান্তোলের রাজধানীতেও তৎকালে বিবিধশাস্ত্রবিশারদ বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বসতি ছিল। সুপণ্ডিত জয়দেব, তর্কবিশারদ

* L. N. Ghose, *The Modern History of Indian Chiefs, Rajas and Zamindars*, pt. II.

** James Grant, *Analysis of the Finances of Bengal in Fifth Report*, Appendix IV.

রামকৃষ্ণ, দিব্যসিংহ, অনন্তরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সান্তোলের রাজসভার অলঙ্কার ছিলেন।*

রাজা রামকৃষ্ণ ডেমরার রায়বংশের সর্বাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া, সর্বাণী দেবীকে বর্তমান রাখিয়া ১১১৭ শকে (১৭২০ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গারোহণ করেন।** হরিপুর-নিবাসী বারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর পূর্বপুরুষ দেওয়ান রামদেব চৌধুরী সান্তোল রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন। রাণী সর্বাণী নিয়ত ধর্মকর্মে জীবন যাপন করিতেন, দেওয়ান রামদেব সমুদায় রাজকার্য পরিদর্শন করিতেন। বগুড়ার দশ ক্রোশ দক্ষিণে করতোয়া নদীর প্রাচীন খাদের তীরবর্তী ভাব্‌তা গ্রামে সর্বাণী দেবী এক প্রাচীনতীর্থের লুপ্তোদ্ধার করিয়া,

করতোয়াতটে গুল্‌ফং বামে বামনভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥" *

এই তন্ত্রোক্ত বচন অবলম্বন করিয়া তাহাকে "মহাপীঠ" সংজ্ঞা প্রদান করেন। রাণী সর্বাণী এই সকল পুণ্যকীর্তির জন্য হিন্দুসমাজে সম্মান-শালিনী হইলেও রাজস্ব অনাদায়ে নবাব দরবারে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমেই অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন মহম্মদ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া সান্তোলের রাজপুরী শ্মশানভস্মে পরিণত করিল! রাণী সর্বাণী প্রাণত্যাগ করিলেন। উত্তরাধিকারিহীন সান্তোল-রাজ্য দেওয়ান রামদেব চৌধুরীর সহায়তায় ১৭২১ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা রামজীবনের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। †

* লঘু-ভারতম্। ** গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

* তন্ত্রচূড়ামণি।

† নাটোর রাজবংশের বর্ণনা করিতে গিয়া একজন স্বদেশীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজস্বনির্ণয়কার্যে রঘুনন্দন যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারই পুর-স্কারস্বরূপ নবাব তাঁহাকে সান্তোল রাজ্য অর্পণ করেন। উক্ত লেখক নিজ গ্রন্থের ভূমি-কায় লিখিয়াছেন যে, তিনি নাটোর রাজবংশের "কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নিকট এই সকল কথা অবগত হইয়াছেন।"

কেহ কেহ বলেন যে, "ভাতুড়িয়াদিগের জমিদার রামকৃষ্ণ ১১১৭ সালে পরলোক গমন করিলে তাঁহার জমিদারী রাণী সর্বাণীর নামেই চলিত ছিল, কিন্তু রঘুনন্দন তাঁহার কার্য সম্পাদন করিতেন; অবশেষে অল্প-দিনের মধ্যে উত্তরাধিকারিহীনা সর্বাণী দেবীর মৃত্যু হওয়ায়, সেই জমি-দারী রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে হস্তান্তরিত হয়।"*

চাক্‌লা মুর্শিদাবাদের অধীন নিজ চাক্‌লা রাজসাহীতে উদিতনারায়ণ নামে একজন প্রাচীন জমিদার ছিলেন। রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী পরগণে রাজসাহী তাঁহার জমিদারী ছিল। প্রতিভা ও কার্যদক্ষতায় উদিতনারায়ণ রঘুনন্দনের সমকক্ষ ছিলেন, এবং উভয়েই নবাবের সমধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজস্বনির্ণয়ের নূতন বন্দোবস্ত শেষ হইবার পর রাজধানীর নিকটবর্তী অধিকাংশ জমিদারীর শাসন, সংরক্ষণ ও রাজস্বসংগ্রহের ভার উদিতনারায়ণের উপরেই ন্যস্ত হয়। এইরূপে বার্ষিক ৯০৫৩২৪ টাকা রাজস্বের ৬৯ পরগণায় উদিত-নারায়ণের জমিদারী নির্দিষ্ট হইয়াছিল।** এই বিস্তীর্ণ জনপদের কর-সংগ্রহকার্যে সাহায্য করিবার জন্য গোলাম মহম্মদ জমাদার নামক এক-জন মুসলমান সেনানায়কের অধীনে দুইশত অশ্বারোহী উদিতনারায়ণের আজ্ঞাধীন ছিল, এবং উদিতনারায়ণ রাজসাহীর রাজা ও নবাবদরবারের সর্বপ্রধান সামন্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অতি সামান্য কারণে উদিতনারায়ণের সর্বনাশ হইয়া গেল। কয়েক মাস বেতন না পাইয়া উদিতের সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান না করিয়া বাহুবলে বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জন্য নবাব একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। নবাব সৈন্যের সঙ্গে উদিতের বিদ্রোহী সৈন্যের যুদ্ধ হইয়া গোলাম মহম্মদ নিহত হইলেন; মনঃক্ষোভে উদিত-

* *The Rajas of Rajshahi*, Kishori Chand Mitra, *Calcutta Review*, vol. LVI.

** James Grant, *Analysis of the Finances of Bengal*.

নারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন।* দুইশত সৈন্যের বিদ্রোহ আর কয় দিন থাকিবে? বিদ্রোহ নির্বাপিত হইল, কিন্তু অরাজকতায় রাজসাহী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল! নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ রায় নামে উদিতের দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্র বর্তমান ছিল; কিন্তু রাজধানীর নিকটবর্তী রাজসাহীর ছত্রভঙ্গ জনপদ তাহাদের ন্যায় শিশুর শাসনাধীন করা নিরাপদ নহে বলিয়া নবাব রঘুনন্দনকেই রাজসাহী রাজ্য প্রদান করিলেন; রঘুনন্দন ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে** রামজীবন ও তৎপুত্র কালিকাপ্রসাদের নামে রাজসাহী রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।[৫]

বর্তমান রাজসাহী জেলা পদ্মানদীর বামতীরে, উদিতের রাজসাহী রাজ্য তাহার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল; সেখানে এখনও পরগণা রাজসাহী বর্তমান আছে।† এই রাজসাহী রাজ্য লাভ করিয়া রাজা রামজীবন রাজসাহীর মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব দরবারের সর্বপ্রধান সামন্তের আসন প্রাপ্ত হইলেন। এই সূত্রে নাটোর রাজবংশের অধিকৃত সমুদয় রাজ্যই "রাজসাহীর জমিদারী" বলিয়া পরিচিত হইল এবং যখন যে পরগণা রাজসাহী ভিন্ন জেলাভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি রাজসাহী রাজাদিগের নাটোরের রাজবাটী ও পদ্মার বামতীরস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ এখনও রাজসাহী বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। রাজসাহীর রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে রামজীবনের রাজনৈতিক ক্ষমতাও বর্ধিত হইয়া উঠিল—তিনি সৈন্যবলে ও পদগৌরবে সকলের নিকটেই পরিচিত হইলেন। অতঃপর উদিতনারায়ণের বংশধরগণ নাটোর রাজবংশের নিকট মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন; রাজসাহীর

---

* Stewart, *History of Bengal from the first Muhammedan Invasion until the Virtual Conquest of Bengal by the English in 1757*, London, 1813.

** গৌড়ে ব্রাহ্মণ, মহিমাচন্দ্র মজুমদার।

† W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. IX, London, 1877.

বিস্তীর্ণ রাজ্য নাটোর রাজবংশের হস্তচ্যুত হইলেও কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহারা যে ইংরাজ কালেক্টারের নিকট হইতে বৎসরে ৯৪৮ টাকা এবং ২৪০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন, তাহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের কাগজপত্রে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজসাহীর জমিদারী পাইয়াই নাটোর-রাজবংশ বাঙ্গলার ইতিহাসে সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবে মূল দলিল বিপর্যস্ত হওয়ায় ইহার কালনির্দেশ করিতে অনেকে গোলযোগ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ইতিহাসলেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের সমকালীন অন্যান্য ঘটনার সহিত এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; বোধ হয়, তাহা হইতেই নবনারী-রচয়িতা ১১১৫ সালে ইহার কালনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র ১১২০ সালে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়া উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন একটি কাহিনীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি কি সূত্রে কোন্ কথা জানিয়াছিলেন, কোন স্থানে তাহার উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার কোন কথারই সত্য মিথ্যা বিচার করিবার উপায় নাই। তিনি বলেন যে, উদিতনারায়ণ নিজেই বিদ্রোহী হন, এবং রঘুনন্দন তাঁহাকে বন্দী করিয়া পুরস্কারস্বরূপ রাজসাহীর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।*

রঘুনন্দনের মন্ত্রণাসাহায্যে বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ পরগণাই নবাবের করায়ত্ত হইয়াছে;—ত্রিপুরা, আসাম ও কুচবিহারের স্বাধীন রাজারাও নবাবের প্রসন্নতালাভের প্রত্যাশায় সময়ে সময়ে উপঢৌকন পাঠাইতেছেন,

---

* "In 1120 Uditnarain, the Zamindar of Rajshahi, being discontented with the oppression of the officers of the Nawab, rebelled, collected his adherents, and retired to the hills of Sultanuba. Raghunandana was deputed to arrest him. He seized and confined him in prison for which service he was rewarded with the Zamindari of Rajshahi which he took in 1121 in the name of his brother Ramjiban".—*The Rojas of Rajshahi*, Kishorichand Mitra, Calcutta Review, Vol. LVI.

কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে একটি নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য কিছুতেই নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতেছে না। যখন সমুদয় বাঙ্গলাদেশ মুর্শিদ কুলী খাঁর পদানত, তখনও দক্ষিণবঙ্গে সীতারামের স্বাধীনপতাকা নবাবের রাজশক্তিকে উপহাস করিতেছিল।

সীতারাম কে? একজন ইংরাজ ইতিহাসলেখক বলেন যে, "তিনি একজন দস্যুদলপতি বিদ্রোহী জমিদার;—দস্যুদলের সহায়তায় জলে স্থলে দস্যুতা করিয়া লোকের ধনসম্পত্তি গোমহিষাদি অপহরণ করিতেন, এবং ভূষণা চাক্‌লার মুসলমান ফৌজদারের রাজধানীর নিকটে থাকিয়াও তাহার রাজশক্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।"* কথাটি কত দূর সত্য, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক,—তাহার সহিত নাটোর রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে।

আরঙ্গজীবের শাসনসময়ের চরমদশায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ছোটখাট অনেকগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সেই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে ভূষণা চাক্‌লায় মধুমতী-তীরে হরিহর নগরে সীতারাম রায় নামে একজন দরিদ্র কায়স্থ বাস করিতেন। শ্যামনগর নামে একখানি ক্ষুদ্র তালুক ভিন্ন সীতারামের আর কোন সম্পদ ছিল না;—কিন্তু বাহুবলে, অসীম সাহসে, উজ্জ্বল প্রতিভায়, সীতারাম প্রকৃতিদত্ত সৌভাগ্য-গর্বে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। সত্যের সঙ্গে কল্পনা জড়িত হইয়া সীতারামের কাহিনী এতই জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, এখানে তাঁহার উত্থান-পতনের আনুপূর্বিক ইতিহাসের যথাযথ বিচার করিবার অবসর নাই। মূল কথা এই যে,—মুসলমান রাজ্যের অধঃপতনসময়ে সুযোগ বুঝিয়া দক্ষিণ-বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের আশায়, সীতারাম বাহুবলে ভূষণা চাক্‌লার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া মহম্মদপুরে রাজদুর্গ নির্মাণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার রাজধানীর ও কীর্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে।[৬]

* C. Stewart, *History of Bengal etc.* London, 1813.

সীতারাম মুসলমান-রাজ্যে বাস করিয়া একদিনের জন্যও মুসলমানকে করপ্রদান করেন নাই। বহু বিন্দু জল একত্র মিশিয়া মহাসাগর রচিত হইয়াছে, বহু ধূলিকণা একত্র মিলিয়া পর্বতশৃঙ্গ গঠিত হইয়াছে ;—সীতারামও ভাবিয়াছিলেন, বিলাসলোলুপ বাদশাহের দুর্বলমুষ্টি হইতে তিল তিল করিয়া বঙ্গভূমি কাড়িয়া লইয়া পুনরায় হিন্দু রাজ্য গঠন করিবেন। সীতারামের আশার আকাশ-কুসুম মুকুলেই শুকাইয়া গিয়াছে ;—কিন্তু তাহার শোভাটুকু সৌরভটুকু ইতিহাস এখনও সযত্নে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে! বাঙ্গালীর নিকট সীতারামের সমুচিত সমাদর হয় নাই ;—কিন্তু ইতিহাসের কীর্তিমন্দিরে মহারাষ্ট্রকুলপ্রদীপ শিবাজীর জন্য যদি অমরসিংহাসন রচিত হইয়া থাকে, তাহার পার্শ্বে কায়স্থকুলতিলক সীতারামের বসিবার স্থানের অভাব হইবে না! আশা সফল হয় নাই বলিয়া সীতারামের গৌরব ক্ষুন্ন হইতে পারে না। ইতিহাস যাহাদের ললাটে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া দুরপনেয় কলঙ্করেখা আঁকিয়া দিয়াছে, তাহাদের ইতিহাসে সীতারামের যোগ্য স্থান কোথায়?

সীতারামকে পরাস্ত করিবার জন্য নবাব যতই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন, সীতারামের প্রবল পরাক্রম ততই চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে আবু তোরাপের পরাজয়ে ও অকালমৃত্যুতে নবাব ভীত হইয়া পড়িলেন। সে সংবাদ বাদশাহের কর্ণগোচর হইবার পূর্বেই যাহাতে সীতারামকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারেন, তাহার জন্য মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। অবশেষে মন্ত্রণাদাতা রঘুনন্দনের উপরেই সকল ভার ন্যস্ত হইল। রঘুনন্দন চারি দিক হইতে খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করিয়া বাহুবলের সঙ্গে বুদ্ধিকৌশল মিশাইয়া সীতারামকে পরাজয় করিবার জন্য পার্শ্ববর্তী জমিদারদিগের সাহায্য লইবার পরামর্শ দিলেন, এবং নাটোর রাজবংশের সাহসী ও সুচতুর দেওয়ান দয়ারাম রায়কে সংগ্রাম সিংহের অধীন সৈন্যদলের সহিত ভূষণায় প্রেরণ করিলেন। এতদিন বাহুবলে যাহা অসম্ভব হইয়াছিল, এবার বুদ্ধিকৌশলে তাহা সম্ভব হইল। অল্পদিনের মধ্যেই দয়ারাম সীতারামকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ভূষণারাজ্যে নবাবের

বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিলেন। যশোহরের ইতিহাসলেখক বলেন যে, "সীতারাম বন্দিভাবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহাকে শূলারোহণে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"* স্বাধীনচেতা সীতারাম কুক্কুরের ন্যায় বধ্যভূমিতে নীত হইবেন, রাজপথের কৌতূহলপরায়ণ জন-প্রবাহ তাঁহার উদ্দেশে লাঞ্ছনা ও উপহাস বর্ষণ করিবে,—সীতারামের সে কলঙ্ক সহ্য হইল না। তিনি "১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ রাজকারাগারে বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক চুম্বন করিয়া মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন!"**[৭]

সীতারামের জীবন ও মৃত্যুকাহিনী লইয়া হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মুসলমান ইতি-হাসলেখক ও তাঁহার ইংরাজ অনুবাদক বলেন যে, সত্য সত্যই সীতারাম মুর্শিদাবাদে শূলদণ্ডে প্রাণবিসর্জন করেন।* জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া একজন হিন্দুলেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, সীতারাম বন্দিদশায় নাটোর রাজবাটীতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।** ইহার কোন্ কথা সত্য?

সীতারাম পরাজিত হইলে তাঁহার ভূষণারাজ্য রামজীবন প্রাপ্ত হন; এবং রামজীবনের কর্মচারী দয়ারাম রায় নবাব দরবার হইতে পুরস্কারস্বরূপ "রায়-রাইয়ান" উপাধি* ও সীতারামের অনেক তৈজসপত্র প্রাপ্ত হন; তাঁহার কোন কোন দ্রব্য এখনও দয়ারামের বংশধরদিগের দিঘাপতিয়ার রাজবাটীতে বর্তমান আছে। নাটোর রাজবাটীর একটি অন্ধতমসাচ্ছন্ন জীর্ণ কক্ষ দেখাইয়া লোকে এখনও বলিয়া থাকে যে, সেই গুপ্ত কক্ষে সীতারাম বন্দিদশায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জনশ্রুতির মূল কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সীতারামের মৃত্যু হইলে নবাব দিল্লীর দরবারে সেই সংবাদ দিবার সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, মুর্শিদাবাদে তাঁহার সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। সীতারাম আত্মহত্যাই করুন, আর শূল-দণ্ডেই নিহত হউন, তাঁহাকে একবার ধরিতে পারিয়া নবাব যে চক্ষের

* **Westland's *Jessore.*** ** ***Ibid.***

* **Stewart, *History of Bengal etc.*** ** লঘুভারতম্।

* ***The Rajas of Rajshahi etc.***

অন্তরালে নাটোরের রাজকারাগারে রাখিতে দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

সীতারামের মৃত্যুকাল লইয়াও কথঞ্চিৎ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। একজন বাঙ্গালী লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, খৃষ্টাব্দ ১৭৬৪ পর্যন্তও যে সীতারাম জীবিত ছিলেন, তাহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের কাগজপত্রেই প্রকাশ আছে।* লেখক যে কাগজপত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের একখানি সরকারী পত্র ;—তাহাতে লিখিত আছে যে, "দস্যুদল মিষ্টার রস্ সাহেবকে হত্যা করিয়া সীতারামের জমিদারী মধ্যে পলায়ন করিয়াছে।"** ইংরাজগণ বহুদিন পর্যন্ত ভূষণা অঞ্চলকে "সীতারামের জমিদারী" বলিয়া উল্লেখ করিতেন ; সুতরাং তাহা হইতে সীতারাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত থাকা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না!

উদিতনারায়ণের "রাজসাহী রাজ্য" পাইয়া নাটোর রাজবংশের রাজনৈতিক পদগৌরব, রামকৃষ্ণের "সান্তোল রাজ্য" পাইয়া হিন্দুসমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি, এবং সীতারামের "ভূষণারাজ্য" পাইয়া চারিদিকে বাহুবলের পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহার পর ক্রমে পরগণার পর পরগণা রামজীবনের হস্তগত হইতে লাগিল, এবং মহারাজা রামজীবন স্বরাজ্যে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদায় ক্ষমতাই পরিচালন করিবার অধিকার পাইলেন।

মহারাজা রামজীবন নবাবের প্রিয় জমিদার বলিয়া ক্রমে ক্রমে যে সকল নূতন জমিদারী পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সেকালে হাবেলি, মহম্মদাবাদ, সাহুজিয়াল, তুঞ্জী, স্বরূপপুর প্রভৃতি কতকগুলি পরগণা কিশোর খাঁ, সমসের খাঁ এনায়েত খাঁর জমিদারী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। পরগণে পুখুরিয়ার জমিদারীও তখন ইস্‌কিন্দার বেগ নামক একজন মুসলমান জমিদারের শাসনাধীন ছিল। নরহত্যা

* *The Rajas of Rajshahi*, etc. গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

** **Long,** ***Selections from the unpublished Records of Government from 1748-1767 included,*** **Calcutta, 1869**

অপরাধে এই সকল মুসলমান জমিদার রাজ্যচ্যুত হইলে রামজীবন সেই সকল জমিদারী প্রাপ্ত হন। জামালপুরের জমিদার এনায়েতুল্লা রাজস্ব-প্রদানে অসমর্থ হইয়া ফতেহাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জমিদারী রামজীবনের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন।* এইরূপে যে সকল জমিদারী রামজীবনের হস্তগত হয়, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে নবাব সরকারে ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর ও ২১৩৯৫ টাকা বাজে জমা, একুনে ১৭,৬৩,৩৮২ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হইত।

নবাবী আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদিগকে বেতন দিবার রীতি ছিল না। নবাব, প্রধান সেনাপতি, ফৌজদারগণ—সকলেই বেতনের পরিবর্তে জায়গীর পাইতেন, এবং নৌসেনাদির জন্যও জায়গীর বন্দোবস্ত ছিল। এই সকল জায়গীরের মধ্যে মহারাজা রামজীবনের হস্তে অনেক জায়গীরের শাসনভার অর্পিত হয়। তাঁহাকে বৎসরে যে ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর দিতে হইত, তন্মধ্যে কেবল ১৬৯৬০৮৭ টাকা "খালসা" জমিদারীর জন্য; অবশিষ্ট রাজকরের মধ্যে ৭৬৪ টাকা "আয়মা" এবং ৪৫১৩৬ টাকা জায়-গীরের জন্য প্রদান করিতে হইত। জায়গীর বা আয়মার উপর বাজে জমা ধার্য হইত না; সুতরাং মহারাজা রামজীবন নবাব সরকারে ১৩৯ পরগণা-ভুক্ত "খালসা" জমিদারীর জন্য ১৩৯৬০৮৭ রাজকর এবং ২১৩৯৫ বাজে জমা প্রদান করিতেন। এই রাজকর ও বাজে জমা ভিন্ন তাঁহাকে আর কিছু দিতে হইত না; বিস্তীর্ণ জমিদারী হইতে ইহার অতিরিক্ত যত টাকা আদায় হইত, সে সকলই তাঁহার রাজশ্রী বর্ধন করিত। এত অধিক ঐশ্বর্য-লাভ করিয়া, বাঙ্গলাদেশের সর্বপ্রধান সামন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রঘুনন্দনের প্রভুত্ব ও বুদ্ধিকৌশলের সাহায্যে মহারাজা রামজীবন নবাব-দরবারে সবিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিলেন।

* *The Rajas of Rajshahi* etc.

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. খালসা—Revenue Department, applied also to land the revenue of which is paid into the state treasury. N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, vol. II, Calcutta, 1968, p. 234.

২. The transfer of the capital from Dacca to Murshidabad, (then Makhsusabad) was yet another landmark in Bengal history. The process began when Murshid Quli Khan transferred the dewani offices from Dacca to Murshidabad, with the removal of the *Subahdar's* residence from Dacca to Patna in 1703. The centre of gravity of Bengal shifted to Murshidabad, initially the *dewan's* residence but later on that of the *Subahdar* himself. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, p. 5.

৩. রাই রাইয়ান—ইনি ছিলেন খালসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী।

৪. হাজি মুস্তাফার তারিখ-ই-বাঙ্গালার মতে সৈয়দ বাদি খাঁ ছিলেন প্রথমে হুগলীর ফৌজদার, পরে বাঙ্গলার দেওয়ান। 'বৈকুণ্ঠ' নামক নরকটি তাঁহার সৃষ্টি।

৫. তারিখ-ই-বাঙ্গালার মতে রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ নবাব মুর্শিদ-কুলীখাঁর প্রাপ্য রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হন। তাঁহার সেনাধ্যক্ষ গোলাম মহম্মদের অধীনে ২০০ অশ্বারোহী ছিল। এই সৈন্যবাহিনী লইয়া তিনি নবাব প্রেরিত সেনা-বাহিনীর বিরোধিতায় অগ্রসর হন। নবাবী সেনার অধ্যক্ষ ছিলেন মহম্মদজান। উভয়পক্ষে রাজবাড়ীতে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে গোলাম মহম্মদ পরাজিত ও নিহত হইলে উদয়নারায়ণ বন্দীদশা এড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করেন। ইহার পর এই জমিদারীর মালিক হইলেন রামজীবন। ফোলিও ৩৭ খ এবং ৩৮ ক।

৬. স্যার যদুনাথের মতে সীতারাম প্রথমে বাদশাহের নিকট হইতে নড়াইল পরগনার ইজারা লাভ করেন। ক্রমে তিনি পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি পরগনার অধিকার লাভ করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করেন। শীঘ্রই তাঁহার অধীনে গঠিত হইল এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। কথিত আছে যে, তিনি দিল্লীর সম্রাটের কাছ হইতে এক ফরমান বলে 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ভূষণা হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত বাগজানিতে রাজধানী স্থাপন করেন। জনৈক মুসলমান পীরের নামানুসারে নতুন রাজধানীর নামকরণ হইল মহম্মদপুর। এই নগরটিকে তিনি এক দুর্ভেদ্য দুর্গে

পরিণত করিয়া উহাতে বহু সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিম খাঁর দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তিনি নবাবের সহিত বিরোধিতায় লিপ্ত হন। হুগলীর ফৌজদার আবু তুরাপ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলে নতুন নবাবী ফৌজ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। এই যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত এবং সপরিবারে বন্দী হইলে তাঁহার রাজধানী নবাবী সৈন্য অধিকার করিয়া লয় (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৭১৪)। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার শেষ হিন্দু রাজ্যের পতন ঘটে। **Sir Jadunath Sarkar, Ed., *History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948, p. 416.**

৭. যশোহর-খুলনার ইতিহাসের লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন: সম্ভবত ১১২০ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসে (১৭১৪ ফেব্রুয়ারী) সীতারাম বন্দী হন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার পরিবারবর্গ কলিকাতায় ধরা পড়িয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন··· ১১২১ সালের আশ্বিন মাসে মুর্শিদাবাদে সীতারামের মৃত্যু হয়; তাহা হইলে ১৭১৪ ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কয়েক মাস তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন বলিতে পারি। যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২৯, পৃঃ ৫৯৯, পাদটীকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক পদগৌরব

রাজকার্য উপলক্ষে রঘুনন্দনকে সর্বদাই নবাব দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত। সেই জন্য, রামজীবন যেমন নাটোরে রাজবাটী নির্মাণ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, রঘুনন্দনও সেইরূপ আজিমগঞ্জের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে এক নূতন বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজদিগের নিকট এই স্থান কখন বড়নগর, কখন বা বীর-নগর নামে পরিচিত হইয়াছিল, এবং লোকে এখনও ইহাকে "নাটোরের রাজবাটী" বলিয়া থাকে। কিন্তু নাটোর রাজবাটী অপেক্ষা বড়নগরের রাজবাটীর সঙ্গেই বাঙ্গলার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠতর সংস্রব। রঘুনন্দন যখন এই বাটীতে বাস করিতেন, তখন তাঁহার সৌহার্দ্যলাভের জন্য বাঙ্গলার ছোট বড় সকল জমিদারকেই কখন না কখন এই বাটীতে পদার্পণ করিতে হইত। মহারাণী ভবানী গঙ্গাবাস উপলক্ষে অধিকাংশ জীবন এই বাটীতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং এই বাটীর প্রাচীরসংলগ্ন ভাগীরথীতীরে মহারাজা রামকৃষ্ণ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছিলেন। বড়নগর রাজবাটীর আর সে সৌভাগ্য-গর্ব নাই, রাজ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাটীও জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; কেবল কয়েকটি দেবমন্দির এখনও পূর্ব সৌভাগ্যের নীরব সাক্ষীস্বরূপ ধ্বংসাবশেষের ইষ্টকস্তূপের মধ্যে দৃঢ়ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! উদিতনারায়ণের রাজসাহী রাজ্যের অধিকাংশ স্থান মুর্শিদাবাদ চাক্‌লার অধীন ছিল, সেই জন্য বড়নগরের রাজবাটীই প্রকৃতপক্ষে রাজসাহী রাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

এই রাজবাটীতে বসিয়া রঘুনন্দন যেরূপ মন্ত্রণা দিতেন, নাটোর-রাজ-বাটীতে বসিয়া রামজীবন তদনুসারেই রাজ্যশাসন করিতেন। জনশ্রুতি

এইরূপ যে, রামজীবন সাহসী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মশীল, দীর্ঘকায়* বলিষ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন ; কিন্তু বাহুবলের অনুরূপ বুদ্ধিকৌশল ছিল না। রঘুনন্দন সেরূপ বীরপুরুষ না হইলেও বুদ্ধিকৌশলের জন্য বাঙ্গলাদেশের মধ্যে একজন প্রতিভাশালী মন্ত্রণাকুশল "মুৎসুদ্দি" বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন; শিক্ষার সঙ্গে প্রতিভা মিলিত হইয়া রঘুনন্দনকে সমধিক ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিল। রঘুনন্দনের সেই অসীম ক্ষমতাই রাজ্যলাভের মূল কারণ ; কিন্তু সেকালের ভ্রাতৃপ্রেম দুই ভাইকে এক বৃন্তের যুগল কুসুমের মত এমন অভেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে, রঘুনন্দন সর্বতোভাবে রাজসাহীর বিস্তীর্ণ জনপদের প্রভু হইয়াও জ্যেষ্ঠের নিকট দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, এবং প্রতিভা ও ক্ষমতাবলে নবাব-দরবার হইতে যখনই কোন নূতন জমিদারী পাইতেন, তাহা জ্যেষ্ঠের চরণেই উৎসর্গ করিয়া দিতেন।

মুর্শিদ কুলীখাঁর নবাবী আমলে কেবলমাত্র বীরভূমিই যবন জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল ; তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদায় চাক্‌লাতেই হিন্দু জমিদারদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। সেই সকল হিন্দু জমিদারদিগের মধ্যে দিনাজপুরাধিপতি শূদ্রবংশীয় রামনাথ, নবদ্বীপাধিপতি ব্রাহ্মণবংশীয় রঘুরাম, এবং নাটোরাধিপতি রামজীবন ও রঘুনন্দনই সর্বপ্রধান বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তি ও ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পদগৌরবলালসা স্বভাবতই প্রবল হয় ;—রামজীবন এবং রঘুনন্দনও ক্রমে সামাজিক পদগৌরববৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতাদি ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজক ঋষিদিগের অনুশাসনক্রমেই হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইত ; কিন্তু মুসলমানাধিকার সময়ে বাঙ্গলাদেশে কিছু কিছু মতবিবর্তন আরব্ধ হইয়াছিল। শকাব্দা

* রাজসাহীর কালেক্টারীতে "মহারাজা রামজীবনের হাতকাঠীর" একটি মাপ আছে ; তাহা ২২ ইঞ্চি।—তাহাই যদি প্রকৃত প্রস্তাবে রামজীবনের হাতের মাপ হয়, তবে তিনি যে সবিশেষ 'দীর্ঘকায়' ছিলেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

১২৫০ সালের সমকালে "বারেন্দ্রনন্দনাবাসীয় ভট্টদিবাকরাত্মজ শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট"[১] মেধাতিথিবিরচিত প্রাচীন মানব-ভাষ্যের দোষ দেখাইয়া "মন্বর্থমুক্তাবলী"* নামক একখানি নূতন টীকার প্রচলন করেন। ন্যায়শাস্ত্র-বিশারদ অভিনব "গৌড়ীয় পণ্ডিতগণ" নূতন নূতন যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়া প্রাচীন স্মৃতির পরিবর্তে বাঙ্গলাদেশে নব্যস্মৃতির প্রচলন করেন। কালক্রমে জীমূতবাহনের[২] "দায়ভাগ" এবং রঘুনন্দন স্মার্তশিরোমণির[৩] "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের" সঙ্গে বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত, এবং বাঙ্গলাদেশের হিন্দুসমাজে অনেকগুলি নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বল্লালসেন শ্রেণীবিভাগ ও কুলমর্যাদানিরূপণ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন, বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং কুলীন এবং শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কন্যা আদানপ্রদানের কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছিল না; কুলীন পিতা আবশ্যকমত শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিলেও কুলচ্যুত হইতেন না। কুল্লুকভট্টের সমসময়ে কাশ্যপগোত্রীয় ভাতুড়ীবংশে তর্কশাস্ত্রবিশারদ বৃহস্পতি আচার্যের ঔরসে উদয়নাচার্য জন্মগ্রহণ করেন।** তিনি বারেন্দ্রদেশে অভিনব সমাজ-সংস্কার আরম্ভ করিয়া

* "সারাসারবচঃ" প্রপঞ্চনবিধৌ মেধাতিথেশ্চাতুরী
স্তোকং বস্তুনিগূঢ়মল্পবচনাদ্গোবিন্দরাজো জগৌ।
গ্রন্থেঽস্মিন্ ধরণীধরস্য বহুশঃ স্বাতন্ত্র্যমেতাবতা
স্পষ্টং মানবমর্থতত্ত্বমখিলং বক্তুং কৃতোঽয়ং শ্রমঃ॥
প্রায়ো মুনিভির্বিবৃতং কথয়ত্যেষা মনুস্মৃতেরর্থং।
দশভির্গ্রন্থসহস্রৈঃ সপ্তদশযুতৈঃ সুনৃতা বৃত্তিঃ॥
সেয়ং ময়া মানবধর্মশাস্ত্রে ব্যধায়ি বৃত্তির্বিদুষাং হিতায়।
দুর্বোধজাতেদুরিতক্ষয়ায় ভূয়াৎ ততো মে জগতামধীশঃ॥"
"সমাপ্তেষা শ্রীমৎকুল্লুকভট্টবিরচিতা মন্বর্থমুক্তাবলী।"

** কেহ কেহ ইহাকেই কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা কাশ্যপগোত্রীয় ছিলেন না।

দিলেন। কৌলীন্যসংস্থাপক বল্লালসেন "ভাদড়াঃ পংক্তি-পূরকাঃ" বলিয়া ভাদড়গ্রামী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকেও কুলীন করিয়াছিলেন; উদয়নাচার্য নিতান্ত অনাবশ্যকবোধে তাহাদিগকে কুলচ্যুত করিয়া দিলেন। কুলীনগণ শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিতেন, ইহা তাঁহার বিচারে বড়ই অকীর্তিকর ও গ্লানিজনক বলিয়া বিবেচিত হইল। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" —ইহা অনেক দিনের পুরাতন কথা। সেই পুরাতন মহাজন-প্রদর্শিত পথারোহণে কুলীনগণ দুষ্কুল শ্রোত্রিয় হইতে "স্ত্রীরত্ন" গ্রহণ করিবার অধিকারী; কিন্তু তাই বলিয়া জানিয়া শুনিয়া সেই দুষ্কুল শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিবেন কেন? উদয়নাচার্যের তর্কস্রোতে সমুদয় "সনাতনী প্রথা" ভাসিয়া গিয়া কুলীন পিতার পক্ষে শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করা রহিত হইল; এবং বারেন্দ্র কুলীনসমাজে "করণ" নামক পরিবর্ত-মর্যাদা সংস্থাপিত হইল।

বল্লালসেনের কৌলীন্যের সঙ্গে উদয়নাচার্যের কৌটিল্য মিলিত হইয়া কুলীন-কুমারীদিগের সার্বদ্বারিক বিবাহের পথ বন্ধ হইয়া গেল। কুলীন পিতা এবং শ্রোত্রিয় পিতা উভয়েই কুলীন বরের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন; উভয়ের প্রতিযোগিতায় কুলীন বর দুর্মূল্য হইয়া উঠিল, কুলীনদিগের মধ্যে "আচারো বিনয়ো বিদ্যা" ক্রমশঃ দুর্লভ হইয়া উঠিতে লাগিল:—অবশেষে বারেন্দ্রসমাজে বহুবিবাহ এবং কু-বিবাহ প্রচলিত হইয়া উঠিল। কুলীনের সদ্‌গুণরাশি কালক্রমে "লীন" হইয়া "কু" টুকু অবশিষ্ট থাকিয়া গেল!

যখনই কোন নূতন মত প্রচারিত হয়, তখনই তাহার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুইটি দল হইয়া থাকে;—উদয়ের সময়েও তাহাই হইল। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি ও শচীপতি নামক ছয় পুত্র মধু মৈত্রেয়ের কুলবহিষ্কৃত আনন্দ ও অর্জুন নামক পুত্রদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া এক নূতন দল গঠন করিলেন; কিন্তু প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া এই দল "কাপ" নামে পরিচিত হইল। কাপের ও কুলীনের মধ্যে দলাদলি জাঁকিয়া উঠিতে

লাগিল ;—কাপের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদান করা ত দূরের কথা, তাঁহাদের সঙ্গে আহারাদি করিলেও লোকের কুলচ্যুতি হইতে লাগিল! এই চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর "উপকারের করণে" লিপ্ত হইয়া নাটোররাজবংশের পূর্বপুরুষ জীবর মৈত্রেয় কাপ-দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কাপের দল দিন দিনই পুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কুলীনদিগের নিয়ম যতই কঠিন হইতেছে, তাহাতে লোকের কুলচ্যুতির পথ ততই সহজ হইয়া উঠিতেছে, ইহা দেখিয়া তাহিরপুরের বিখ্যাত শ্রোত্রিয় রাজা কংস-নারায়ণ মধ্যস্থ হইয়া কতকগুলি নূতন বিধান প্রচলিত করিয়া দিলেন। ইহাতে কাপদিগের পক্ষে পুনরায় কৌলীন্যলাভের উপায় হইল না বটে, কিন্তু শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিয়া কাপ হইতে শ্রোত্রিয় হইবার, এবং শ্রোত্রিয় হইয়া কুলীনবরে কন্যাদান করিয়া সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইবার উপায় হইল। জীবর মৈত্রেয়ের বংশধরগণ কাপ হইয়াছিলেন, পরে শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিয়া শ্রোত্রিয় হন; রামজীবন ও রঘুনন্দন সিদ্ধশ্রোত্রিয় হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নান্ন্যাসী-গ্রামী পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশে রাজা কংসনারায়ণ[৫] জন্ম-গ্রহণ করেন। কুলীনগণের আশ্রয়দাতা বলিয়া বারেন্দ্রসমাজে পদগৌরবে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। রামজীবন ও রঘুনন্দনের সমসময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাহিরপুরে রাজত্ব করিতেন। রামজীবন ও রঘুনন্দন সেই লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত কুমার কালিকাপ্রসাদের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে চেষ্টা ফলবতী হইতে অধিক বিলম্ব হইল না; রাজসাহীর ভবিষ্যৎ মহারাজা "কালু কোঙারকে" কন্যাদান করিতে লক্ষ্মীনারায়ণের কোনরূপ ইতস্ততঃ থাকিলেও, নবাব-দরবারে রঘুনন্দনের প্রভুত্ব থাকায়, তাহা লইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পাইলেন না। কালিকাপ্রসাদের সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার শুভবিবাহ হইয়া নাটোর রাজবংশের সামাজিক পদগৌরবলাভের পথ সহজ হইয়া গেল।

বাঙ্গলাদেশ দিল্লী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। বাঙ্গলার জলবায়ুর

দুর্নামে দিল্লীর দরবার পরিপূর্ণ; সুতরাং বাদশাহেরা বাঙ্গলাদেশ শাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া শোষণ করিবার চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেন। সেই জন্য বাঙ্গলার নবাবেরাও এই দেশ যথারীতি শাসন করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রমাগত "দেহি দেহি" রবে করসংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেন; আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য জমিদারদিগের হাতেই পড়িয়া থাকিত। রাজা এরূপ উদাসীন হইলে রাজপ্রসাদ না পাইয়া দেশের শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষা ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়ে। বাঙ্গলার জমিদারগণও যদি নবাবদিগের মত কেবলমাত্র করসংগ্রহেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে দীর্ঘকাল মুসলমানশাসনাধীন থাকিয়া বাঙ্গালী জাতি একেবারে সভ্যতার নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িত। বাঙ্গালী প্রবীণ সুসভ্য আর্যজাতি যে নিরক্ষর বর্বর জাতিতে পরিণত হয় নাই, বাঙ্গলার জমিদারগণই তাহার মূল কারণ। তাঁহারা শিল্প বাণিজ্য ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাধ্যানুসারে উৎসাহদান করিতেন বলিয়া বাঙ্গালীমাত্রেই এখনও তাঁহাদিগের লুপ্তস্মৃতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে বহন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলার অনেক প্রাচীন জমিদার বংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাহারও কাহারও ইতিহাস-বিখ্যাত রাজভাণ্ডার ভিক্ষাপাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের বংশগৌরব এখনও বহুমানাস্পদ হইয়া রহিয়াছে।

নাটোর রাজবংশের রাজোন্নতি ও সামাজিক গৌরববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের অবশ্যকর্তব্য সদনুষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রামজীবন ও রঘুনন্দন যেমন প্রবলপ্রতাপে রাজকর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, সেইরূপ শিক্ষা ও শিল্প বাণিজ্যের উৎসাহ দিবার জন্যও মুক্ত-হস্তে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেকালে এ দেশে সংস্কৃত, পারসী ও বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন ছিল। হিন্দু স্বাধীনতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবার হইতে সংস্কৃত ভাষা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গলা ভাষার তখন পর্যন্তও ভাল করিয়া দন্তোদগম হয় নাই; সুতরাং একমাত্র পারসী বা উর্দু ভাষাই বহুলরূপে

প্রচলিত হইয়াছিল। রাজকার্য উপলক্ষে যাঁহাদিগকে নবাব-দরবারে গতিবিধি করিতে হইত, তাঁহারা বাধ্য হইয়া রাজভাষা অভ্যাস করিতেন ; কিন্তু সকলেই কোনরূপে কাজ চালাইবার মত পারসী শিক্ষা করিয়াই মৌলবী হইয়া উঠিতেন, তাহাতে উচ্চশিক্ষার অভাব পূরণ হইত না। অগত্যা সংস্কৃতই উচ্চশিক্ষার একমাত্র সোপান হইয়া উঠিয়াছিল। আজ-কাল সংস্কৃতশিক্ষা ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। কিন্তু সেকালে রাজা জমিদার ও রাজসভার সদস্যগণ সকলেই সংস্কৃত ভাষায় পরিপক্ক হইতেন ; সম্ভ্রান্ত বংশের হিন্দু সন্তানদিগের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা সাধারণতঃ নিন্দার বিষয় ছিল। অনেকেরই সংস্কৃত-শিক্ষায় সবিশেষ অনুরাগ ছিল ; কিন্তু অধ্যাপকগণ বিনামূল্যে বিদ্যা বিতরণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের অধ্যাপনাকার্যে রাজার সাহায্য আবশ্যক হইত। মুসলমান রাজত্বে হিন্দু জমিদারগণ মুক্তহস্তে সাহায্যদান না করিলে সংস্কৃতশিক্ষা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু রামজীবন ও রঘুনন্দনের সংস্কৃত ভাষার উপর আশৈশব অনুরাগ থাকায়, রাজসাহী রাজ্যে তাঁহাদের উৎসাহে সংস্কৃতশিক্ষা ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতে লাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম নামক বিখ্যাত নৈয়ায়িক মহারাজা রামজীবনের একজন সভাসদ ছিলেন। রামজীবন যে সত্য সত্যই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শর্মা ১৬৪৫ শকে (১৭২৩ খৃষ্টাব্দে) পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া বঙ্গদেশে চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। পদাঙ্কদূতের ললিতলাবণ্যময়ী কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখনও আনন্দাশ্রু বিমোচন করিয়া থাকেন। পদাঙ্কদূত ক্ষুদ্র চম্পূ-কাব্য, কিন্তু তাহার ছত্রে ছত্রে যে লিপি-কৌশল ও পদলালিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই কবির যশঃ চিরজীবী হইয়াছে। কবি কাব্যশেষে লিখিয়া গিয়াছেন,

"শাকে সায়কবেদষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্মার্পয়ন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দন-পদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।

চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ ॥”*

* বেণীমাধব দে কোম্পানী বটতলা হইতে পদাঙ্কদূতের যে বিকৃত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতে শেষোক্ত চরণটি একটু বিভিন্ন করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রঘুরাম রায়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অনুসন্ধানপ্রিয় পাঠক তাহা পাঠ করিয়া পদাঙ্কদূতের কবির লেখনীপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। এ বিষয়ে “গৌড়ে ব্রাহ্মণ”-রচয়িতা যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :—

“নমস্কারনিবেদনমেতৎ

১১ আপ্রীল দিবসীয় আপনার পত্র পাইয়াছি। আমার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর এবং বগুড়াতে বিদ্যাভাস এবং বিষয় কার্য্য করিয়াছি। বাটী যাতায়াতে রায়গঞ্জ থানার অন্তঃপাতী ঘুরকাগ্রামের নিকট হইয়া যাতায়াত করিতাম, এবং বহুবার ঘুরকাতে নামিয়া পাক শাক করিয়া খাইয়াছি। ঐ ঘুরকাগ্রামে মোরশেদাবাদ চক্রের ভূতপূর্ব জজ আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিবাস ছিল; অদ্যাপি তাঁহার বাটীর দালান বর্ত্তমান আছে। পদাঙ্কদূতরচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ঐ কৃষ্ণনাথের পিতামহ, এবং তিনি পদাঙ্কদূত রচনা করিয়াছেন, ঐ সুযোগে জ্ঞাত হই। বগুড়ার ত্রিলোচন সিদ্ধান্তের বাটী হইতে আমি একখান পদাঙ্কদূত প্রাপ্ত হই, এবং বাল্যকালে নকল করি, তাহাতে রামজীবন পাঠ ছিল স্মরণ হয়। এবং বগুড়া অঞ্চলের প্রাচীন পণ্ডিতের শুনা এবং বিশ্বাস যে, পদাঙ্কদূত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথের পিতামহ এবং নাটোরের রামজীবনের সভাসদ ছিলেন। কৃষ্ণনাথ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক তাহা আপনিও বোধ হয় শুনিয়াছেন। পদাঙ্কদূত পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণও নৈয়ায়িক ছিলেন। ১৮৪৩ শকাব্দে শ্রীরামপুর যন্ত্রে ডাক্তার জান্ হেবরলীন্ কর্ত্তৃক দেবনাগরাক্ষরে কাব্যপ্রকাশ ছাপা হয়, তাহাতে যে শ্লোক আছে, তাহাই অবিকল আমি নকল করিয়া উঠাইয়া দিয়াছি। রঘুরামের আজ্ঞাতে পদাঙ্কদূত রচনা হইয়াছে, ইহা আমি পূর্বে শুনি নাই।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম, তৎপিতা রামজীবন। রঘুরাম ১৬৫০ শকে অভাব হন। রামজীবনের অন্তে রঘুরাম রাজা হন। ১৬৪৫ শকে নদীয়ার রামজীবন রাজা ছিলেন না, এই সকল কারণে গৌড়ে ব্রাহ্মণে নাটোরের সভা হইতে পদাঙ্কদূত প্রস্তুত হওয়া লিখিয়াছি। নিবেদনমিতি—শ্রীমহিমাচন্দ্র শর্ম্মা মজুমদারস্য নিবেদনম।”

বাদশাহ আরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর হইতে মোগলের অবশ্যম্ভাবী অধঃপতন ক্রমেই খরবেগ ধারণ করিতেছিল। একজন ভাল করিয়া সিংহাসনে বসিতে না বসিতেই আর একজন আসিয়া বাহুবলে অথবা মন্ত্রণাকৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিতে লাগিলেন। মোগলের "ময়ূরসিংহাসন" যতই ক্রীড়াপুতুলে পরিণত হইতে লাগিল, চারিদিকে ততই ছোটখাট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল;—সেই বিপ্লবের অনুকম্পায় বাঙ্গলার নবাবও প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া এক দল রবাহূত বিদেশীয় বণিক ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে বাঙ্গলাদেশে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বিদেশীয় বণিক এখন সমুদয় ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট; তাঁহাদের ইতিহাসই নব্য বাঙ্গলার ইতিহাস, তাঁহাদের কাহিনীই ভারত-বাসীর নিত্য আলোচনার বিষয়। নাটোর রাজবংশের, বিশেষতঃ রাণী ভবানীর জীবন-কাহিনীর অনেক ঘটনার সঙ্গে তাঁহাদের সংস্রব—সুতরাং বাহুল্যভয়ে ভীত হইলেও, তাঁহাদিগের কথা এবং তাঁহাদিগের কীর্তি-কলাপের কিয়ৎপরিমাণে আলোচনা করিতে হইবে।

পর্তুগালের রাজা ইমান্যুয়েলের শাসনসময়ে বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডি গামার উদ্যোগে ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কৃত হয়; পর্তুগীজ নাবিকগণ উৎসাহে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলে পদার্পণ করেন। কিন্তু তাঁহারা পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা সত্য নহে;—"ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ ভীরু কাপুরুষ নহে, যাহার ইচ্ছা সেই আসিয়া বাহুবলে বা ছলকৌশলে তাহাদের দেশ কাড়িয়া লইবার সুবিধা নাই; তাহারা বিদ্যাবুদ্ধি ও বাহু-বলে তখন পর্যন্তও জাতীয়বিক্রমের পরিচয় দিতেছে"।* দেখিয়া শুনিয়া অগত্যা রাজ্যলাভের দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় নাবিকগণ বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে,

* Torren's *Empire in Asia.*

প্রথমে দিনামার, তাহার পর ইংরাজ ও তাহার পর ফরাসীরা আসিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে এই সকল বিদেশীয় বণিক ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়া অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁ এই সকল বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে যেরূপ কঠোর হস্তে শুল্কগ্রহণ করিতেন, তাহাতে সকলেই মোগলের অধঃপতনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। এখন সুসময় নিকটে দেখিয়া ইংরাজ বণিক্-সমিতি দিল্লীর দরবারে এক দল প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তোষামোদ, বহুমূল্য উপঢৌকন ও সময়োচিত উৎকোচেরই সমধিক প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। ইংরাজগণ সেই সকল ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া হামিল্টন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসকের চিকিৎসাগুণে শীঘ্রই সম্রাট ফরোকশায়ারের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন।

ইংরাজ বণিকেরা পূর্ব হইতেই কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনখানি গণ্ডগ্রাম লইয়া ভাগীরথীতীরে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া রাজসাহী প্রদেশের নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আরও ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিয়া ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইবার অধিকারযুক্ত সম্রাটের মোহরাঙ্কিত সনন্দ লইয়া, বাঙ্গলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।*৬ ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে এই সনন্দ নবাবের নিকটে উপস্থিত করিবামাত্র নবাব বুঝিতে পারিলেন .য, বাঙ্গলার অন্তর্বাণিজ্য আর বেশী দিন বাঙ্গালীর হাতে থাকিবে না, এবং ইংরাজেরা যেরূপ অকুতোভয় অধ্যবসায়শীল যুদ্ধনিপুণ বণিক্‌জাতি, তাহাতে তাহারা বাঙ্গলাদেশে ৩৮ খানি গ্রামে দুর্গনির্মাণ করিলে বাঙ্গালীকে সসর্প গৃহবাসের ন্যায় সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইবে।

বাঙ্গলার নবাব সর্বতোভাবে স্বাধীন হইলেও, তখন পর্যন্ত বাদশাহের "ফারমাণ" প্রকাশ্যরূপে অমান্য করিতে সাহস পাইতেন না। অগত্যা

* Torren's *Empire in Asia.*

প্রকাশ্যে বাদশাহের ফারমাণ শিরোধার্য করিয়া গোপনে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্য নবাবদরবারে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। ইংরাজগণ বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন, কিন্তু জমিদারগণকে গোপনে শাসন করিয়া দেওয়া হইল যে, কেহ যেন সূচ্যগ্র ভূমিও ইংরাজ বণিকের নিকট বিক্রয় না করেন।*

এই সময়ে রঘুনন্দন নবাব দরবারের সর্বময় কর্তা, ইংরাজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যস্থান রাজসাহীর জমিদারীর অন্তর্গত; সুতরাং ইংরাজেরা যখন উচিতমূল্য দিয়া একখানি গ্রামও ক্রয় করিতে পারিলেন না, তখন রঘুনন্দনের মন্ত্রণার উপরেই দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ইহাই বাঙ্গালী জমিদারদিগের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম বিবাদ; সে বিবাদে নখাগ্রগণনীয় ইংরাজ বণিককেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।** কিন্তু বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়া ইংরাজ বণিক জলে স্থলে সর্বত্রই নিজমূর্তি ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং দেশের নিরীহ লোকের উপর অনেক অন্যায় উৎপীড়ন হইতে আরম্ভ হইল।

* Stewart, *History of Bengal* etc.

** "The prudent foresight of Moorshud cooly khan, added to his resentment at the success of the Embassy, made him behold with indignation the concession of this article; but not daring openly to oppose the Imperial mandate, he privately threatened the proprietors of the land with denunciations of his vengeance, if they parted with their ground upon any terms that should be offered; and the Company's servants confiding too much in the sanction of the Emperor's firman, neglected the more efficacious means of bribing the Nuwab to compliance with their wishes. Thus the most important concession which had been obtained by the Embassy was entirely frustrated."—C. Stewart, *History of Bengal* etc.

ইংরাজদিগের এই সকল অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য নবাব তাঁহাদিগের অন্তর্বাণিজ্যে বাধা প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। নবাবদরবারের বিচক্ষণ দেওয়ান রঘুনন্দন রায় বাদশাহের ফারমাণ হইতেই প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, পান সুপারি তামাক গুড় প্রভৃতি গরিবলোকের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া অন্তর্বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজগণ কোনই ক্ষমতালাভ করেন নাই। অগত্যা ইংরাজ বণিক অন্তর্বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে ইউরোপে পণ্যদ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজের নিশান উড়াইয়া যাহারা জলে স্থলে কলিকাতাভিমুখে পণ্যদ্রব্য বহন করিত, তাহাদিগকে কিছুমাত্র শুল্ক দিতে হইত না। সুতরাং ইংরাজের অধীনে পর্তুগীজ, আর্মানী, মোগল এবং হিন্দুরাও কলিকাতায় বাস করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন; সামান্য গণ্ডগ্রাম হইতে কলিকাতা একটি সমৃদ্ধিশালী মহানগরে পরিণত হইতে লাগিল।

মুর্শিদ কুলীখাঁ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় ও ন্যায়-পরায়ণ নবাব বলিয়া হিন্দুমুসলমানের নিকট সুপরিচিত। তিনি সুরাপান করিতেন না, একটিমাত্র সহধর্মিণীতে অনুরক্ত থাকিয়া সর্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে রাজকার্য পরিদর্শন করিতেন, এবং কঠোর শূলদণ্ডে দস্যু তস্কর নিধন করিয়া এবং বিদেশে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ রহিত করিয়া, জমিদারদিগের সহায়তায়, অকুতোভয়ে বাঙ্গলাদেশে রাজত্ব করিতেন।

যদিও সহসা মুর্শিদ কুলীখাঁকে তাড়িত করিয়া কাহারও পক্ষে সিংহাসন কাড়িয়া লওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি দিল্লীর দরবারের ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখিয়া মহম্মদাবাদের দুইজন পাঠান জমিদার সেনা সংগ্রহ করিয়া, পার্শ্ববর্তী জনপদ লুণ্ঠন করিয়া, পথিমধ্যে নবাবের ৬০০০০ টাকা অপহরণ করিয়া ১৭২০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে আহসান আলীখাঁ হুগলীর ফৌজদার এবং নবাবের সবিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। নবাব তাঁহার উপরেই এই বিদ্রোহদমনের ভার সমর্পণ করিলেন। আহসান আলীর চেষ্টায় অতি

অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহী পাঠানদ্বয় বন্দিদশায় মুর্শিদাবাদে আনীত হইল। মুসলমান বলিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়া নবাব তাঁহাদের মহাম্মদাবাদের জমিদারী তাঁহার প্রিয় জমিদার রামজীবনকে অর্পণ করিলেন। রাজকোষের যে ৬০০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছিল, তাহা পার্শ্ববর্তী সমুদয় জমিদারদিগকে অংশানুসারে পূরণ করিয়া দিতে হইল।*

মুর্শিদ কুলীখাঁ ইহার পর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না।[৭] মৃত্যুকাল নিকট হইতেছে দেখিয়া, তিনি স্নেহভাজন দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসাইবার আশায় দিল্লীতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সরফরাজের পিতা সুজা খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইয়াছিলেন, তিনি পুত্রের সিংহাসনলাভের সম্ভাবনায় সুখী হওয়া দূরে থাকুক, নিজেই পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া গোপনে গোপনে দিল্লীতে প্রার্থনা জানাইতে আরম্ভ করিলেন। আমীরল্ উমরা খাঁন্ দৌরান্ তখন দিল্লীর দরবারের সর্বময় কর্তা। তিনি নামে বাঙ্গলার নবাব হইয়া সুজা খাঁকে বাঙ্গলার রাজপ্রতিনিধি করিতে সম্মত হইলেন। সুজা খাঁ সেই সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া বৃদ্ধ নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর মৃত্যুদিনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

কুলীখাঁর শেষ জীবন এই সকল কারণে বড়ই তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। জীর্ণ শরীর ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; উৎসাহ ও কার্যতৎপরতাও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কুলীখাঁর সৌভাগ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাটোর রাজবংশের সম্পদলাভ হইয়াছিল, আবার কুলীখাঁর শেষ জীবনের দুঃখবিষাদের সঙ্গে সঙ্গে নাটোর রাজবংশেও দুঃখবিষাদ উপস্থিত হইতে লাগিল।

১১৩১ সালে (১৭২৪ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ রামজীবনের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলেন!

---

* C. Stewart's *History of Bengal* etc.

পুত্রশোক দারুণ শোক, বৃদ্ধবয়সে সেই শোক শেলের মত রামজীবনের বুকের মধ্যে বিঁধিল। তাহার যন্ত্রণা না ভুলিতেই সেই বৎসরেই রাজসাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, নবাবের মন্ত্রণাকুশল প্রিয়সহচর, মহারাজ রামজীবনের দক্ষিণবাহু, নাটোর রাজবংশের উজ্জ্বল প্রদীপ, রায় রাইয়ান রঘুনন্দন ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। কুলীখাঁ অল্পদিনের মধ্যেই চিরশান্তির আশ্রয় গ্রহণ করায় সুজা ও সরফরাজের মধ্যে সিংহাসন লইয়া প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল!

সুজা খাঁ বাঙ্গলার নবাব হইলেন,—সরফরাজ পিতার সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না। নবাব হইয়াই সুজা খাঁ পূর্বসুহৃদ্ হাজি আহমদ ও আলিবর্দী নামক দুই জন সুশিক্ষিত মুসলমানকে আনিয়া সর্বময় কর্তা করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন নাই, রাজকুমার কালিকাপ্রসাদ নাই,—সুতরাং এতদিন নবাবদরবারে রাজসাহীর রাজার জন্য যে উচ্চাসন নির্দিষ্ট ছিল, তাহাতে বসিবার আর কেহই রহিল না। শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ মহারাজ শাখাপত্রহীন শুষ্কতরুর ন্যায় শেষ ঝটিকার অপেক্ষায় নাটোর রাজবাটীতে বসিয়া বিষণ্ণ হৃদয়ে দিন গণনা করিতে লাগিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. মনুসংহিতার 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামক টীকার রচয়িতা হিসাবে ইনি সবিশেষ পরিচিত। এই গ্রন্থটি ছাড়া তিনি 'স্মৃতিসাগর' নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকের অনুমান ইনি পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

২. জীমূতবাহন রাঢ় দেশের পারিভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশ শতকে ইহার জীবিতকাল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। 'কালবিবেক', 'ব্যবহারমাতৃকা' এবং 'দায়ভাগ' এই তিনটি গ্রন্থের রচয়িতা। দায়ভাগ তাঁহার সর্বাধিক বিখ্যাত গ্রন্থ। বাঙালী হিন্দু সমাজে উত্তরাধিকার, সম্পত্তিবিভাগ এবং স্ত্রীধন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় দায়ভাগের নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩. স্মার্ত রঘুনন্দন ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন। ইনি ছিলেন বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার। ইনি যে-সব গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য 'জ্যোতিষতত্ত্ব', অষ্টাবিংশতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত 'উদ্বাহতত্ত্ব', 'দায়ভাগতত্ত্ব' এবং 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব'।

৪. ব্রাহ্মণের সমাজবন্ধন বিশেষ; ভঙ্গ কুলীন। 'কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে বহু দোষাশ্রিত ব্যক্তি—এক সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাঁহারা 'কাপ' বা 'কপট' নামে অভিহিত হন। ইহারা পরে কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যবর্তী আসন প্রাপ্ত হন। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, শুভ বিবাহ।

৫. কংসনারায়ণ তাহিরপুরের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ইনি নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্গাপূজা করেন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, 'কংসনারায়ণ বস্তুতই ঐভাবে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা গবেষণার বিষয়—সামাজিক ইতিহাস নামধেয় 'রূপকথা' তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না।' দ্রষ্টব্য, বঙ্গে দুর্গোৎসবের ইতিবৃত্ত, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৫৯, পৃঃ ১০।

৬. ইংরাজ কোম্পানির পক্ষে ফরমান লাভের জন্য যে দৌত্য প্রেরিত হয় তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন পাটনা কুঠির **John Surman.**

৭. মুর্শিদকুলী খাঁর পরলোক প্রাপ্তির কাল ৩০শে জুন, ১৭২৭ খ্রীঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহ

বিল বাসবের বর্ষাসলিলপ্লাবিত নিম্নভূমি সমুন্নত করিয়া, মহারাজ রাম-জীবন তাহার উপর নবপ্রতিষ্ঠিত নাটোর রাজবাটীর বিচিত্র সৌধমালা রচনা করিয়াছিলেন। সম্মুখে দৃঢ়োন্নত সিংহদ্বার, চারিদিকে সমুন্নত পুর-প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে প্রশান্তসলিলা দুর্গ-পরিখায় সুশোভিত হইয়া, রামজীবনের রাজবাটী রাজসাহী প্রদেশের গৌরববর্ধন করিয়াছিল। যে তিনটি দুর্গপরিখা চক্রাকারে রাজবাটী পরিবেষ্টন করিয়া শত্রুসেনার আক্রমণ প্রতিহত করিত, তাহা এখন স্থানে স্থানে জলশূন্য হইয়াছে ;—রামজীবনের গৌরবমণ্ডিত সিংহদ্বারের জরাজীর্ণ ভগ্নাবশেষমাত্র এখনও বর্তমান আছে। পুরাতন রাজবাটীর অধিকাংশ রাজপ্রাসাদ কালক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ; যাহা কিছু অতীত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান ছিল, তাহাও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে ধরাবিলুণ্ঠিত হইয়াছে।*

এই ঐতিহাসিক রাজবাটীতে বাস করিয়া মহারাজাধিরাজ রামজীবন সবিশেষ উৎসাহে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন ও কালিকা-প্রসাদের পরলোকগমনে তাঁহার উৎসাহ অনুরাগ অবসন্ন হইয়া পড়িল! আর সেকালের যৌবনোৎসাহ নাই ; আর বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব-দেওয়ান কনিষ্ঠ সহোদর রঘুনন্দন নাই ; আর অতুল রাজসম্পদের এক-মাত্র উত্তরাধিকারী কুলপ্রদীপ কালিকাপ্রসাদ নাই ;—এখন কেবল শোক-তাপপূর্ণ বৃদ্ধদশা! বাহুবলে, সংগ্রাম-কৌশলে, প্রতিভাগুণে, যে বিস্তীর্ণ রাজসাহী রাজ্য গঠিত হইল, তাহা উপভোগ করিবে কে, তাহাই রাম-জীবনের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

* রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত 'দোলমঞ্চ' নাটোর রাজবাটীর সমধিক শোভাবর্ধন করিত ; এখন তাহার চিহ্নমাত্রও বর্তমান নাই। দোলমঞ্চের ভিত্তিমূলে যে তাম্রফলক নিহিত ছিল, তাহা এখনও নাটোরাধিপতির রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাই পূর্বগৌরবের যৎসামান্য নিদর্শন।

সকলেই দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আবার বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকেই রাজ্যদান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অবশেষে দত্তকপুত্র গ্রহণ করাই স্থির হইয়া গেল।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক গৌড়ের বাদশাহদিগের অধীনে কাশ্যপগোত্রীয়, ভাদুড়ী-বংশজাত, সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ নামে তিন ভাই উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান-রাজ সরকারে ইঁহারা খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগদানন্দ খাঁর পাঁচু রায় ও ভুবন রায় নামে দুই বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচুর পুত্র রসিক রায় মহারাজ রামজীবনের সমসাময়িক ব্যক্তি। রসিক রায়ের দুইটি সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র-সন্তান ছিল ; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটিকে মহারাজ রামজীবন দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন।* এই দত্তকপুত্র নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা, এবং বাঙ্গালার ইতিহাসে মহারাজ রামকান্ত নামে সুপরিচিত।

রসিক রায় পুত্রদান করিয়া রামজীবনের বংশরক্ষা করিলেন ; রামজীবনও প্রত্যুপকারস্বরূপ তাঁহাকে দুইটি মূল্যবান ভূসম্পত্তি দান করিলেন। নবাব সরকারে মহারাজ রামজীবনের নামে ঘোড়াঘাট চাক্‌লায় তপ্পে ভাতুড়িয়ার অন্তর্গত বার্ষিক ৭৭৬০ টাকা জমায় পরগণা চৌগ্রামের জমিদারী লিখা যাইত।** রসিক রায় উক্ত চৌগ্রাম ও ইসলামাবাদ নামক দুইটি পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। রসিকের পুত্র কৃষ্ণকান্ত চৌগ্রামে রাজবাটী নির্মাণ করিয়া বংশানুক্রমে “চৌগ্রামের রাজা” বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই রাজসম্পদ এখন তাঁহার কুলভূষণ প্রপৌত্র সুপণ্ডিত রাজা রমণীকান্ত রায় বি. এ. উপভোগ করিতেছেন।

রামকান্তকে দত্তকগ্রহণ করায় রামজীবনের সামাজিক পদগৌরব অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পাঁচু রায় এবং ভুবন রায় উভয়েই শ্রেষ্ঠ

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ, মহিমাচন্দ্র মজুমদার।
** James Grant, *Analysis of the Finances of Bengal etc.*

কুলীন; সুতরাং তাঁহাদের বংশের সন্তানকে দত্তকগ্রহণ করায় রামজীবনের পদগৌরব আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিল না।

রামজীবন দত্তকগ্রহণ করায় সকলেই সমধিক আনন্দলাভ করিলেন; কেবল বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ বিমর্ষ হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের অকালমৃত্যুতে দেবীপ্রসাদের আশালতা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, অপুত্রক রামজীবনের অতুল রাজসম্পদ অতঃপর তাঁহারই করতলগত হইবে। দেবীপ্রসাদের সৌভাগ্যলাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছিল; রামকান্তকে দত্তকগ্রহণ করায় তাহা আবার কণ্টকপুর্ণ হইল; সুতরাং দেবীপ্রসাদের হর্ষবিন্দু বিষাদসিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া গেল।

রামজীবন, রঘুনন্দন এবং বিষ্ণুরাম, তিন-সহোদর। তিন জনেই একান্নে এক বাটীতে পরমসুখে জীবন যাপন করিতেন। রঘুনন্দনের উত্তরাধিকারী ছিল না; রামজীবনের দত্তকপুত্র রামকান্ত এবং বিষ্ণুরামের ঔরসপুত্র দেবীপ্রসাদ ভিন্ন নাটোর রাজসম্পদের আর কোনও অধিকারী নাই! সুতরাং দেবীপ্রসাদ বুঝিলেন যে, রামকান্তকে শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধ দত্তকপুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, তিনি কেবলমাত্র অর্ধরাজ্যের অধিকারী; আর যদি তাঁহাকে অসিদ্ধ দত্তকপুত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়, তবে একমাত্র দেবীপ্রসাদই সমগ্র রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধিপতি। কিন্তু রামজীবনের জীবনকালে এ সকল কূটতর্ক উপস্থিত করিতে সাহস হইল না; দেবীপ্রসাদ নিতান্ত বিষণ্নহৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দেবীপ্রসাদের মনের ভাব অধিক দিন গোপন রহিল না। রাজদরবারে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পরামর্শদাতার কখনও অভাব হয় না। মধুমত্ত মধুকর যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে মধুচক্রের আশেপাশে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, রাজদরবারেও সেইরূপ মক্ষিকারূপী হিতাকাঙ্ক্ষিগণ, আবশ্যক না থাকিলেও, গায়ে পড়িয়া সদুপদেশ দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। ইঁহাদের সুপরামর্শে কখনও কখনও সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করে, কিন্তু সেরূপ সৌভাগ্য প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না;—অধিকাংশ স্থলে

দংশন-যাতনাই সার হইয়া থাকে। রামজীবনের ভাগ্যেও তাহাই হইতে লাগিল। তিনি এই সকল পরমহিতাকাঙ্ক্ষিগণের কথায় বার্তায় আকারে ইঙ্গিতে অল্পদিনের মধ্যেই দেবীপ্রসাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, এখন সময় থাকিতে কোনরূপ মীমাংসা না করিলে, কালে ইহা হইতেই তুমুল গৃহকলহের সূত্রপাত হইবে। সেই জন্য, রামজীবন দেবীপ্রসাদকে অনেক বুঝাইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য-পিপাসা শান্ত করিবার জন্য, তাঁহাকে রাজসাহী রাজ্যের ছয় আনা অংশ দান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।* ইহাতে দেবীপ্রসাদের হিতৈষিবর্গ আহ্লাদিত না হইয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দেবী-প্রসাদ রামকান্তকে স্বীকার করিয়া লইলেও যখন অর্ধরাজ্য লাভ করিতে সক্ষম, তখন তিনি ভিখারীর মত ছয় আনা অংশের দানগ্রহণ করিবেন কেন? রামজীবন বুঝিলেন যে, দেবীপ্রসাদ সহজে সম্মত হইবেন না এবং এখন সম্মত হইলেও কালে গৃহকলহের সূত্রপাত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না। সুতরাং তিনি আর পীড়াপীড়ি করিলেন না; সমুদয় রাজ্যই রামকান্তের থাকিয়া গেল।

রামজীবনের বিস্তৃত রাজ্যের তিন স্থানে তিনটি প্রধান রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। নাটোর, বড়নগর এবং সেরপুরে এই সকল রাজ-ধানীর কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বড়নগরের রাজধানীই রাজসাহী রাজ্যের সর্বপ্রধান রাজধানী; তথায় চাক্‌লা মুরশিদাবাদ ও নিজ চাক্‌লা রাজসাহীর সমুদায় রাজকার্য নির্বাহিত হইত। রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের উপর বড়নগরের পরিদর্শনভার ন্যস্ত ছিল; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে রায় রাইয়ান রঘুনন্দন সর্বময় কর্তা ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বড়নগর, এবং পূর্ববঙ্গে সেরপুর,—এই দুইটি প্রধান কর্মস্থল। সেরপুর বড় পুরাতন স্থান। ইহা এখন বগুড়া জেলায় পরগণে মেহমানশাহীর অন্তর্গত। সম্রাট আক্‌বরের সময়ে শাহজাদা সেলিমের নামানুসারে সেরপুর কিছু

* *The Rajas of Rajshahi* etc.

দিবস "সেলিমনগর" নামে পরিচিত ছিল। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে সেরপুরে একটি বাদশাহী কেল্লা ছিল; আইন-ই-আক্‌বরীতে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৯ হইতে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মহারাজ মানসিংহ বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনভার পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে সেরপুরে একটি রাজবাটী নির্মাণ করেন। গত শতাব্দীতে সেরপুর একটি গণ্যমান্য স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রাচীন মানচিত্রে* দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেরপুর পূর্ববাঙ্গলার প্রান্তরাজ্যের প্রধান নগর বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই জন্য এখানে "বারদ্বারী কাছারি" নামে রাজসাহী রাজ্যের একটি প্রধান কাছারী বাটী নির্মিত হইয়াছিল।** এই কাছারীতে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় হইত। রঘুনন্দনের অভাবে এই সকল প্রধান প্রধান কাছারীর পরিদর্শনকার্য শিথিল হইয়া উঠিতে লাগিল। নাটোর রাজবাটীতে বসিয়া একাকী বিস্তীর্ণ জনপদের শাসনভার পরিচালন করা কত দূর কঠিন, তাহা ক্রমেই রামজীবন উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রামজীবনের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া, অনেকেই তাঁহার শাসনক্ষমতা চূর্ণ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী দয়ারাম রায়ের[১] শাসন-কৌশলে আবার রামজীবনের প্রবল প্রতাপ চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

দয়ারাম সাহসী, প্রভুভক্ত, কর্তব্যনিষ্ঠ, ধর্মভীরু রাজকর্মচারী বলিয়া, রামজীবন তাঁহাকে বহুদিন হইতে সস্নেহে সমাদর করিয়া আসিতেছিলেন; এখন রঘুনন্দনের অভাবে সেই দয়ারাম রায় মহারাজ রামজীবনের দক্ষিণ-বাহু বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিলেন। নাটোর-রাজবংশের ইতিহাসে

* J. Rennel, *A Bengal Atlas*, London, 1780, *Memoir of the Map of Hindoostan* London, 1788.

** W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, London, 1877, Vol. VIII.

দয়ারামের স্মৃতি এখনও চিরজীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। কখনও অসিহস্তে, কখনও বা লেখনীধারণ করিয়া, কখনও ভূষণায়, কখনও বা রাজসাহী অঞ্চলে, যখন যেখানে যেরূপ কার্যের আবশ্যক হইয়াছে, দয়ারাম অকুতোভয়ে, অপরাজিত উৎসাহে, অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে তাহাই সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া রামজীবন সময়ে সময়ে তাঁহাকে যে সকল বহুমূল্য 'তালুক' প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখনকার দিনে একটি ছোটখাট রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দয়ারাম এই সকল রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া রাজসাহী রাজ্যে এবং নবাব দরবারে সবিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। রামজীবন তাঁহার সঙ্গে প্রভুভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না; রাজকুমার রামকান্ত তাঁহাকে দাদা ভিন্ন অন্য কোনরূপ সম্বোধন করিতে পারিতেন না; লোকেও দয়ারামকে সবিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

বিশ্বস্ত মন্ত্রী দয়ারামের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া মহারাজ রাম-জীবন শেষ জীবনে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। ক্রমে চরমকাল উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, দয়ারামকেই রাজকুমার রাম-কান্তের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন।

নানা স্থান হইতে রামকান্তের বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। দয়ারামই সে সকল বিষয়ে সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। অবশেষে দয়া-রামের উদ্যোগে, ছাতিনগ্রাম-নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ভবানী দেবীর সহিত রামকান্তের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। এই রাজ-কুললক্ষ্মী উত্তরকালে বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী নামে চিরপরিচিতা হইয়াছেন।

রাণী ভবানীর বিবাহে অনেক সমারোহ হইয়াছিল। অনেক দেশ বিদেশের রাজা মহারাজেরা নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। নাটোর রাজসংসারের তখন পূর্ণযৌবনের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা; সুতরাং "মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ" এই প্রবাদ সার্থক হইয়াছিল;—কিন্তু সে সকল কথার সঙ্গে আমাদের সংস্রব অল্প। এখনও তাহার কত কিম্বদন্তী

রাজসাহী প্রদেশে প্রচলিত রহিয়াছে।

আত্মারাম একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। ছাতিনগ্রাম অঞ্চলে পদগৌরবে বা মানমর্যাদায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। ছাতিনগ্রামের প্রাচীন অধিবাসীরা বলেন যে, আত্মারামের আগ্রহাতিশয্যে ছাতিনগ্রামেই রাণী ভবানীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল; এবং তদুপলক্ষে বরকর্তা মহারাজাধিরাজ রামজীবনকেও ছাতিনগ্রামে পদধূলি প্রদান করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এখনও একটি স্থান নির্দেশ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সেই স্থানে বরকর্তার বাসাবাটী নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বরকর্তা অন্যের জমিদারীতে পদার্পণ করিতে অসম্মত হওয়ায়, আত্মারাম চৌধুরী সাহ্লাদে ছাতিন গ্রামের একাংশ বৈবাহিককে যৌতুকদান করিয়াছিলেন। এ সকল কাহিনীর সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা সুকঠিন; তবে এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, আত্মারামের ছাতিনগ্রাম কালক্রমে অন্য লোকের জমিদারীভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ছাতিনগ্রামের একাংশ, এখনও নাটোর রাজবংশের অধিকারে রহিয়াছে।

এই বিবাহের পর, মহারাজ রামজীবন অধিকদিন জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু রামকান্তের বিবাহ এবং রামজীবনের মৃত্যুকাল[২] লইয়া ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে বহুদিন হইতে বাদ প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

রামজীবনের স্বর্গারোহণের পরে, রাজকুমার রামকান্ত কয়েক বৎসর পর্যন্ত দয়ারাম রায়ের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া, ১১৪১ সালে নবাবসরকার হইতে নিজ নামে জমিদারী সনন্দ লাভ করেন;* কেহ কেহ বলেন যে, তখন তিনি "অষ্টাদশ বৎসরের তরুণ যুবক।"† মহারাজ রামজীবন ১১৩৭ সালে পরলোক গমন করেন; কেহ কেহ বলেন যে, তখনই রামকান্ত "অষ্টাদশ বৎসরের তরুণ যুবক।"* স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র

* J. Grant, *Analysis of the Finances of Bengal etc.*

† নবনারী, নীলমণি বসাক

* দ্বাদশনারী, দুর্গাদাস লাহিড়ী

লিখিয়া গিয়াছেন যে, দয়ারামের হস্তে রাজসাহী রাজ্যের ও রাজকুমার রামকান্তের রক্ষণভার সমর্পণ করিয়া, মহারাজ রামজীবন ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[৩]* মিত্র মহাশয়ের অন্যান্য অনেক উক্তির ন্যায় এটিও অপ্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। তিনি কোথায় কাহার নিকট হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে কথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ ১১৪৪ সাল; তাহার অন্ততঃ তিন বৎসর পূর্বে, ১১৪১ সালে রামকান্ত যে রাজ্যভার পাইয়াছিলেন, তাহা নবাবী আমলের ১১৪১ সালের "এহিতিমামবন্দীতে" প্রকাশিত রহিয়াছে।† সুতরাং সকল কথা একত্র বিচার করিলে, মহারাজ রামজীবন যে ১১৩৭ সালে (১৭৩০ খৃষ্টাব্দে) পরলোক গমন করেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দিল্লীর বাদশাহের প্রবল প্রতাপ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল; তথাপি লোকে বিপদে পড়িলে বাদশাহের দোহাই দিতে ক্রুটী করিত না। এইরূপে বাদশাহের দোহাই দিয়া সুজা খাঁ দিন কতকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি চিররুগ্ন হইয়া পড়ায়, তাঁহার নামে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ নবাবী করিতেছিলেন। সরফরাজের সময়ে, হাজি আহ্‌মদ এবং আলিবর্দীর প্রতিপত্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

এই সময়ে মুর্শিদাবাদে একরূপ রাজবিপ্লব। পিতা সুজা খাঁকে প্রতিহত করিয়া পুত্র সরফরাজ খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; অবশেষে সুজা খাঁ সিংহাসনে আরোহণ[৪] করায়, সরফ-রাজ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজধানীতে সুজা খাঁর এবং সরফরাজ খাঁর আত্মীয় অন্তরঙ্গগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া-

---

* In 1737, Ramjiban died, leaving the temporary charge of the Raj in the hands of his friend and counsellor Dayaram Rai—*The Rajas of Rajshahi* etc.

† J. Grant, *Analysis of the Finances of Bengal* etc.

ছিলেন। দেশের লোক সুজা খাঁর অনুরক্ত, কিন্তু নানা কারণে সরফরাজ খাঁর উপর বিরক্ত ;—অথচ সুজা খাঁ শয্যাগত, আর অপ্রিয়দর্শন সরফ-রাজ খাঁ তাঁহার নামে রাজ্যশাসনে নিযুক্ত! কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা অল্প লোকেই অনুমান করিতে পারিত। এরূপ অবস্থায় রাজসাহীর ন্যায় বিস্তৃত জনপদের শাসনভার লইয়া দয়ারাম যেরূপ সুকৌশলে প্রজাপালন করিতেছিলেন, তাহাতে নবাব-দরবারে রাজসাহীর গৌরব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। ১১৩৭ হইতে ১১৪১ পর্য্যন্ত দয়ারাম যেরূপ সুকৌশলে রাজ্যরক্ষা করিতেছিলেন, তাহাতে ইচ্ছা থাকিলেও, দেবী-প্রসাদ কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করিতে সাহস পাইলেন না।

দয়ারামের শাসনকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য মিত্র মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দয়ারাম যেরূপ ভাবে রাজসাহীর রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই সবিশেষ প্রশংসাযোগ্য। ইহাতে দয়ারামের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ স্বভাবের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।"* রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, দিঘাপতিয়ায় রাজবাটী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১৪১ সাল (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ) হইতে রামকান্ত স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন কার্যে অগ্রসর হইলেন।

এতদিন দেবীপ্রসাদ যে সুযোগের অপেক্ষায় নীরবে দিনযাপন করিতেছিলেন, দয়ারাম অবসর গ্রহণ করায় সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু নবাব-দরবারে চেষ্টা করিয়া ফল হইল না ; সেখানে তখন পর্যন্তও রঘুনন্দনের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই : সুতরাং রামকান্তের প্রতি সকলেরই সবিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে (১১৪৪ সালে) নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব রাজস্ব-প্রদানে অক্ষম হইলে, নবাব সুজা খাঁর আদেশে তাঁহার জমিদারী রাম-

* "His management of the Raj during the inter-regnum was admirable ; and evinced great sagacity and impartiality"—*The Rajas of Rajshahi etc.*

কান্তের হস্তে সমর্পিত হইল। দেবীপ্রসাদ বুঝিলেন যে, নবাব সুজা খাঁর আমলে তাঁহার আশালতা বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। রামকান্ত রাজ্য-ভোগ করিতে লগিলেন; দেবীপ্রসাদ ঈর্ষাকষায়িতলোচনে তাঁহার ছত্র-দণ্ডের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

মহারাজ রামজীবনের সময়ে অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি জমিদারী রাজসাহীর রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে কত পরগণা রাজসাহীর, কত পরগণা অন্য লোকের, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। রামজীবন এবং রঘুনন্দনের বাহুবলে অথবা শাসন-কৌশলে অনেক স্থান নবাবের অজ্ঞাতসারেও তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। রামকান্ত রাজ্যলাভ করিলে, রাজসাহী রাজ্যের সীমা ও পরগণাদি নির্দিষ্ট হইল, এবং বার্ষিক রাজকর ও বাজে জমার পরিমাণ পুনরায় স্থিরীকৃত হইল।

রামজীবনের সময়ে রাজসাহী প্রদেশে ৬৮ পরগণা, ভাতুড়িয়া প্রদেশে ৩০ পরগণা, ভূষণা অঞ্চলে ২৯ পরগণা, এবং বাজে মহালে ১২ পরগণা, রাজসাহীর রাজ্যভুক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। এতদনুসারে ১৩৯ পরগণার জন্য রামজীবন বার্ষিক ১৭৪১৯৮৭ টাকা রাজকর প্রদান করিতেন। রাম-কান্তের সময়ে রাজসাহী প্রদেশে ৭৮ পরগণা, ভাতুড়িয়া প্রদেশে ২৩ পর-গণা, ভূষণা অঞ্চলে ২১ পরগণা, এবং বাজে মহালে ৪২ পরগণা, মোট ১৬৪ পরগণা ও ১৮৫৩৩২৫ টাকা বার্ষিক রাজকর নির্দিষ্ট হইল।* পূর্বাপেক্ষা ১১১৩৩৮ টাকা রাজকর বর্ধিত হইল বটে, কিন্তু নূতন বন্দোবস্তে অনেক নূতন পরগণা রামকান্তের রাজ্যভুক্ত হইল। এই সকল পরগণার রাজকর বড় অধিক ছিল না; কিন্তু বিলক্ষণ লাভ ছিল। সুতরাং রাম-কান্তের সময়ে রাজসাহী রাজ্যের সমধিক উন্নতির অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

১১৪১ সাল হইতে ১১৪৭ সাল (অর্থাৎ ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত ছয় বৎসরের ইতিহাস একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। এইরূপ আলোচনা না করিয়া অনেকে অনেকরূপ অদ্ভুত

* J. Grant, *Analysis of the Finances of Bengal* etc.

জনশ্রুতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ের ইতিহাস নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ;—এই সময়ে রাজসাহীর শাসনভার লইয়া "তরুণ যুবক" রামকান্ত রাজসাহীর মহারাজা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ; এই সময়ে বিচক্ষণ বৃদ্ধমন্ত্রী দয়ারাম রায় দিঘাপতিয়ায় রাজবাটী নির্মাণ করিতেছিলেন বলিয়া নাটোর রাজদরবারে সর্বদা গতিবিধি করিতেন না ; এই সময়ে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে কখন সুজা, কখন সরফরাজ উপবেশন করিয়া, নানারূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত করিতেছিলেন।

এই ছয় বৎসর রামকান্ত 'তরুণযুবক' হইলেও কিরূপ সুকৌশলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। রাজসাহী রাজ্যের মত অর্ধবঙ্গব্যাপী সুবিস্তৃত জনপদের শাসন সংরক্ষণ করিয়া যথাকালে নির্দিষ্ট রাজকর প্রদান করাই সেকালে সবিশেষ যোগ্যতার পরিচয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। 'তরুণযুবক' রামকান্তের সমসাময়িক অনেক পুরাতন জমিদার বার্ষিক রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিয়া, এই ছয় বৎসরের মধ্যে অন্যের হস্তে জমিদারীর রক্ষণভার প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামকান্তের ভাগ্যে সেরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত না হইয়া, ক্রমে ক্রমে এই ছয় বৎসরে তাঁহার হস্তে অনেক নূতন জমিদারীর শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছিল। যশোহরের ইতিহাসলেখক* বলেন যে, ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসরের জন্য নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেবের জমিদারী রামকান্তের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। মিত্র মহাশয় বলেন যে, ১১৪৬ সালে রামকান্ত স্বরূপপুর ও পাতিলাদহের জমিদারী প্রাপ্ত হন। † এই ছয় বৎসরের মধ্যে রামকান্ত যে অনেক নূতন জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুজা খাঁর আমলের 'এহিতিমামবন্দী'ই তাহার প্রমাণ।*

* J. Westland.

† *The Rajas of Rajshahi* etc.

* James Grant, *Analysis of the Finances of Bengal* etc.

একালে টাকা থাকিলে নূতন জমিদারী ক্রয় করিতে পারা যায় ; সুতরাং কাহাকেও জমিদারীর উপর জমিদারী ক্রয় করিতে দেখিলে তাহাতে কোনরূপ ব্যক্তিগত যোগ্যতা সূচিত হয় না। নবাবী আমলে এরূপ নিয়ম ছিল না। কেহ বৎসরের রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জমিদারী নিলাম হইত না ; কিন্তু যাঁহারা শাসনকৌশল ও রাজস্বপ্রদানের জন্য নবাব-সরকারে সুখ্যাতি লাভ করিতেন, সেই সকল সুযোগ্য জমিদারের হস্তে ঐ সকল রাজস্বদানবিমুখ জমিদারীর শাসনভার ন্যস্ত হইত। সুতরাং সবিশেষ শাসনকৌশল না থাকিলে, কেহ নবাবী আমলে নূতন জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন না।

নবাব-দরবারে রামকান্তের শাসনকৌশলের পরিচয় না থাকিলে, অন্যের রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইত না। যথাকালে রাজকর প্রদান করা জমিদারদিগের অবশ্যকর্তব্য ; তাহাই তাঁহাদের শাসনকৌশলের প্রধান পরিচয়। মুর্শিদ কুলীখাঁ প্রতি বৎসরের বৈশাখ মাসে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, এবং তদুপলক্ষে নূতন বৎসরের রাজস্বসংগ্রহের জন্য জমিদারদিগকে লইয়া "পুণ্যাহ" করিবার এক অভিনব নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পুণ্যাহদিনে সকল জমিদারকেই স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি পাঠাইয়া জগৎশেঠের বাটীতে উপস্থিত থাকিয়া, পূর্ব বৎসরের রাজকর পরিশোধ করিয়া দিতে হইত ; কপর্দক বাকী থাকিলে এবং সেই বাকী সঙ্গত কারণে "মাফ্" না পাইলে, কেহই নূতন বৎসরের রাজস্ব-সংগ্রহের ক্ষমতা পাইতেন না। জমিদারেরা নবাবসরকারের করসংগ্রহকারী বার্ষিক কর্মচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং পৈতৃক পদগৌরব রক্ষা করিতে গিয়া, অনেকে জগৎশেঠের নিকট ঋণগ্রস্ত হইতেন। এই সকল নিয়ম প্রচলিত থাকায়, কাহারও পক্ষে দুই তিন বৎসরের রাজকর বাকী রাখা সম্ভব হইত না।

আমরা যে ছয় বৎসরের ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছি, সেই ছয় বৎসরে রামকান্ত যে শাসনকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া

অন্যের জমিদারীর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই কথাগুলি বিস্মৃত হইলে মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীর পরবর্তী দুঃখকাহিনী ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ সেই জন্য ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান না করিয়া, রামকান্তকে কল্পনাবলে নিতান্ত অসচ্চরিত্র, বিষয়বুদ্ধিহীন, উচ্ছৃঙ্খল, "তরুণ যুবক" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ! মিত্র মহাশয় রামকান্তের ধর্মনিষ্ঠার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াও তাঁহার বিষয়বুদ্ধিহীনতার উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিতে ত্রুটি করেন নাই।*

প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রী বলিয়া রাণী ভবানী বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী সহধর্মিণী লাভ করিয়া রামকান্ত যে স্বধর্মনিষ্ঠার ও রাজ্যশাসনের জন্য স্বদেশে প্রশংসালাভ করিবেন, তাহা আশ্চর্যের কথা নহে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, মহারাজ রামকান্তের ইতিহাসের সমুচিত সমালোচনা না করিয়া, অনেকেই তাঁহাকে বিষয়বুদ্ধিহীন কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রামকান্ত জীবিত থাকিতে রাণী ভবানী রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই ; কিন্তু তাঁহার পুণ্য কার্যের প্রবাহ তখন হইতেই প্রবাহিত হইয়াছিল। সহসা এক অভিনব রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রামকান্ত ও রাণী ভবানীর সুখের সংসার দুঃখের হাহাকারে ডুবিয়া পড়িল।

নবাব সুজা খাঁর শাসনসময়ে আলিবর্দী বিহারের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া পাটনার নবাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। হাজি আহমদ ও আলিবর্দী বাঙ্গালী জমিদারদিগের নিকট সবিশেষ সুপরিচিত ; সুজা খাঁর দক্ষিণবাহু বলিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদর করিতেন। তাঁহাদের পদগৌরবে, তাঁহাদের ক্ষমতাবিস্তারে, তাঁহাদের লোকপ্রশংসায়,

* When Ramkanta succeeded to the Raj, he was 18 years old. He was a pious man, and devoted his time to the performance of the Pujas and religious duties, but he had no capacity for business.—*The Rajas of Rajshahi.*

সরফরাজ খাঁ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেই জন্য সরফরাজের সঙ্গে আলিবর্দীর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। সুজা খাঁ এই সকল গৃহকলহের আভাস পাইয়া, আলিবর্দীকে পাটনার শাসনভার প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সরফরাজের চক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই সময়ে* লুণ্ঠনলোলুপ নাদির শাহ সসৈন্যে দিল্লী আক্রমণ করিয়া সদর্পে পুরপ্রবেশ করেন। উন্মত্ত নাদির-সৈন্যের উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে দিল্লীর ইতিহাসবিখ্যাত ইন্দ্রপুরী শ্মশানভূমিতে পরিণত হইল। রাজধানীর পল্লীতে পল্লীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কত লোক শত্রুহস্তে নিহত হইল;—কত লোক আহত-শরীরে আর্তনাদ করিতে লাগিল;—যখন চারিদিক হইতে বায়ুবেগে প্রচণ্ড উল্কাপিণ্ড উদ্গীরণ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তখন কত অন্তঃপুরচারিণী অবগুণ্ঠনবতী রমণী ও অসহায় বালকবালিকা অর্ধদগ্ধ কলেবরে একবিন্দু পিপাসার জলের জন্য করুণ ক্রন্দনে রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল,—কেহ তাহার সন্ধান লইবার অবসর পাইল না। সকলেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল! নাদির শাহ যথাশক্তি ভারতলুণ্ঠনব্রত সুসম্পন্ন করিয়া, ভারতরত্ন কোহিনূর কুক্ষিগত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন;—কিন্তু মোগলের প্রবল প্রতাপ আর দিল্লী নগরে প্রত্যাবর্তন করিল না!

এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যে সুজা খাঁ লোকান্তরিত হইলেন; সরফরাজ তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সরফরাজের পাপস্রোত খরবেগ ধারণ করিল;—হাজি আহ্‌মদ পদে পদে অবমানিত হইতে লাগিলেন; বিলাসবাসনার সঙ্গে সঙ্গে পাপলিপ্সা শতমুখী হইয়া ছুটিয়া চলিল; অবশেষে একদিন জগৎশেঠের[৫] পুত্রবধূকে বলপূর্বক প্রাসাদে আনয়ন করিয়া সরফরাজ সম্ভ্রান্ত শেঠবংশের নিষ্কলঙ্ক কুলে কালিমা ঢালিয়া দিলেন।† জগৎশেঠ পাদাহত কালসর্পের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিলেন;

* 8th March, 1739.

† ষ্টুয়ার্ট এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেঠবংশধরদিগের মধ্যে কেহই এই কলঙ্ককাহিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

জমিদারদল তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া সরফরাজের সর্বনাশসাধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সেকালে জগৎশেঠের ন্যায় আর কোনও ক্ষমতাশালী ধন-কুবের ছিলেন কি না সন্দেহ। বাদশাহ ফর্‌রোক্‌শায়ারের "ফারমান" অনুসারে নবাবের বাম পার্শ্বেই জগৎশেঠের আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল।[৫] লোকে বলিত, জগৎশেঠ মনে করিলে কেবলমাত্র স্বর্ণমুদ্রা ঢালিয়া দিয়া ভাগীরথীর স্রোত বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। জগৎশেঠ জমিদারদিগের আশ্রয়-বৃক্ষ ;—যথাসময়ে রাজকর প্রদান করিতে না পারিলে, অনেকেই তাঁহার নিকট ঋণগ্রহণ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতেন। তাঁহার উপর যখন এরূপ অত্যাচার হইয়া গেল, তখন আর অন্য লোকের নিরাপদ হইবার সম্ভাবনা কি ? অগত্যা সকলেই সরফরাজ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া আর কাহাকেও সিংহাসনে বসাইবার জন্য দিল্লীতে দরবার করিতে লাগিলেন। নাদির শাহের নির্যাতনে দশ মাস পর্যন্ত কোনও ফল হইল না ; অবশেষে প্রার্থিত সনন্দ বাহির হইল। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ খাঁকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া, ১৭৪০[৬] খৃষ্টাব্দে, প্রজাসাধারণের শুভাশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া, নবাব আলিবর্দী বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. দয়ারাম রায়—দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নাটোরের আদি-পুরুষ রাজা রামজীবন এবং তাঁহার ভাই রঘুনন্দনের ইনি ছিলেন দক্ষিণহস্ত। ইঁহার প্রধান কীর্তি সীতারামের পরাজয়সাধন। "The ablest servant of Raghu-nandan was Dayaram Roy (of the tili caste), who acted for his chief in the overthrow of Sitaram and enriched himself in the sack of the Raja's capital. He was the founder of the Dighapatiya Raj (Rajshahi district).' Sir J. N. Sarkar, Ed. *History of Bengal* Vol, II, 1948. p. 414.

২. 'রামজীবন বঙ্গাব্দ ১১৩৬, ইংরেজী ১৭৩০ সালে পরলোক গমন করেন।'

বিমলপ্রসাদ রায়, নাটোর রাজপরিবারের সরিকানা বিবাদ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯২ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৯২।

৩. রামজীবনের মৃত্যুকাল সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রদত্ত তারিখটি নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না।

৪. সুজা খাঁর (প্রকৃত নাম সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ) রাজত্বকাল (১লা জুলাই, ১৭২৭—১৩ই মার্চ ১৭৩৯ খ্রীঃ।

৫. জগৎশেঠ কোন নাম-পরিচয় নয়; ইহা বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। উত্তরাধিকারক্রমে এই উপাধিলাভ করেন ফতেচাঁদ (১৭১৫)।

৬. গিরিয়ার যুদ্ধের তারিখ ১০ই এপ্রিল ১৭৪০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজ্য-নাশ

আলিবর্দী জিতেন্দ্রিয় সাধুস্বভাব ধর্মপরায়ণ নরপতি বলিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়াছেন। বিলাসলোলুপ ব্যসনাসক্ত মুসলমান নবাবদিগের ন্যায় সুরা এবং সহচরী লইয়া আত্মহারা না হইয়া, আলিবর্দী, একটিমাত্র সহধর্মিণীতে অনুরক্ত থাকিয়া, সাধ্যানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেন।[১] তাঁহার সাধুস্বভাবের পরিচয় পাইয়া, অল্পদিনের মধ্যেই লোকে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘটনাচক্রের অনতিক্রমণীয় আবর্তনে এরূপ শান্তস্বভাব প্রবীণ নরপতির শাসন-সময়েও রামকান্ত এবং রাণী ভবানীর সর্বনাশ উপস্থিত হইল!

এতকাল পর্যন্ত দেবীপ্রসাদ উপযুক্ত সুযোগলাভ করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে নীরবে দিন-গণনা করিতেছিলেন। রাষ্ট্র-বিপ্লবে সম্পূর্ণ নূতন নরপতি সিংহাসনে পদার্পণ করায়, দেবীপ্রসাদের অভীষ্টপূরণের সুসময় সমুপস্থিত হইল। তিনি নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, মহারাজ রামজীবনের উত্তরাধিকারিহীন রাজসাহী-রাজ্য বড়ই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথোপযুক্ত শাসন-সংরক্ষণের জন্য তিনি একখানি সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, রাজসাহীর ন্যায় অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী বিশাল রাজ্যের রাজকরসংগ্রহের জন্য নবাব সরকার ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং দেবীপ্রসাদের অভিযোগের সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিবার জন্য কালক্ষয় না করিয়া, তাঁহাকেই আবশ্যক "সনন্দ" প্রদাম করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সনন্দখানি এরূপ সুকৌশলে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে দেবীপ্রসাদের হস্তগত হইল যে, রামকান্ত বা রাণী ভবানী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা যখন প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলেন, তখন আর দেবীপ্রসাদের গতিরোধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; তখন তিনি লোকলস্কর লইয়া

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন! সুতরাং দেবীপ্রসাদ সহজেই রামকান্ত এবং রাণী ভবানীকে গৃহতাড়িত করিয়া সগৌরবে রাজসাহীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

নাটোর-রাজবংশের ইতিহাসে ইহাই গৃহবিবাদের প্রথম সূচনা। কিন্তু এই গৃহবিবাদের আনুপুর্বিক কাহিনী লইয়া ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে বহুবিধ বাদপ্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে। রাণী ভবানী যে সত্য-সত্যই রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইয়া জগৎশেঠের সহায়তায় পুনরায় রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনরূপ মতপার্থক্য নাই; এবং নবাব আলিবর্দীর শাসন সময়েই যে এই দুঃখদুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু কি জন্য, কাহার চক্রান্তে, কোন্ সময়ে এই রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া একজন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, "পতি রামকান্ত অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার হৃদয়মন যৌবনোচিত চাঞ্চল্যে পূর্ণ। বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়া, অসংখ্য দাস দাসীর উপর আধিপত্য পাইয়া, তাঁহার যৌবনোচিত হৃদ্বেগ আর কিরূপে নিবৃত্ত থাকিবে? অর্থ অমৃতময়; কিন্তু ব্যবহারের বিপর্যয়ে তাহা হইতে প্রাণনাশক বিষের সৃষ্টি হয়। তরুণ রামকান্ত আর অর্থের ব্যবহার কি জানেন? সুতরাং তাঁহার হস্তে অর্থ অনর্থকর হইল। দয়ারাম বহুকাল হইতে রাজসরকারের কর্মচারী। রামজীবনের মৃত্যুর পর রাম-কান্তের পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হয়। রামকান্তের বিকৃত চরিত্রকে (!) প্রকৃতিস্থ করিবার কারণ তিনি রামকান্তকে নানারূপ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকান্ত সে হিতবাক্য শুনিলেন না। ঐশ্বর্যগর্বে গরীয়ান্ নবীন যুবক দয়ারামকে অবমানিত করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ··· দয়ারাম সুবুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্মনিষ্ঠ। অবমানিত হইয়া রাজভবন হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রতিপালকের অধঃপতন দেখিতে পারিলেন না। ··· রাম-

কান্তের চৈতন্যসম্পাদন দয়ারামের লক্ষ্য। রামকান্তের অধঃপতন অনিবার্য দেখিয়া, সুবুদ্ধির গুণে তিনি ধীরে ধীরে সে লক্ষ্য কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন!

"এই সময়ে বঙ্গদেশ নবাব আলিবর্দী খাঁর শাসনাধীন। অত্যাচার করা তাহাদের অঙ্গের ভূষণ। কুলকামিনীর পবিত্র কুল তাহাদের অত্যাচারে রক্ষা হওয়া বড়ই কঠিন ছিল। চতুর দয়ারাম আলিবর্দী চরিত বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন। ··· তিনি আলিবর্দী সমীপে বলিলেন, 'রাজসাহীর রাজভাণ্ডার অর্থপরিপূর্ণ। অথচ রাজা রামকান্ত আপনাদের প্রাপ্য কর প্রদান না করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছেন। সুতরাং আপনি রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎস্থানে নূতন লোক নিযুক্ত করুন।' দয়ারামের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, অর্থলোলুপ আলিবর্দী এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, রাজ্য কিছুদিন লোকের মনপ্রবোধের জন্য অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়া, পরে আবার তাহা যবনরাজ্যভুক্ত (!) করিয়া লইব। ··· সৈন্যদল পাঠাইয়া আলিবর্দী রামকান্তের রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। বলপ্রদর্শনপূর্বক অকারণে অন্যায়রূপে রামকান্তকে সর্বস্বান্ত করিয়া, দয়ারামের অভিলাষক্রমে লোকের মন বুঝাইবার জন্য, দেবীপ্রসাদ রায় নামে ঐ বংশীয় এক ব্যক্তি রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। সস্ত্রীক রামকান্ত গৃহত্যাগী হইয়া জগৎশেঠের শরণ ন।"*

এই সুলেখক যেরূপ উজ্জ্বলভাবে দয়ারাম ও আলিবর্দীর গুপ্ত কথোপকথন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া স্বতই মনে হয় যে, অবশ্যই এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সরস বর্ণনার কোন না কোনরূপ *ঐতিহাসিক প্রমাণ* বর্তমান আছে। সে প্রমাণ কি, লেখক কিন্তু একবারও তাহার উল্লেখ করেন নাই। ঐতিহাসিক জীবন-চরিত লিখিতে বসিয়া, তদুপলক্ষে কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ

* দ্বাদশনারী—দুর্গাদাস লাহিড়ী

করিতে হইলে, যেরূপ নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা ও অনুসন্ধানতৎপরতা থাকা আবশ্যক, আমাদের মধ্যে সেরূপ প্রবৃত্তি প্রয়োজনানুরূপ বিকাশলাভ করে নাই। আমরা সামান্য একটু জনশ্রুতি পাইবামাত্র কল্পনাবলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলি, এবং স্বকপোলকল্পিত চিত্রখানি লইয়া জনসাধারণের নিকট ইতিহাস বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকি! উপন্যাস-পিপাসা এতই প্রবল যে, একটু লিপিচাতুর্য, একটু সরস-পদ-লালিত্য-বিকাশ, অথবা একটু অনুপ্রাস-প্রয়োগ-কৌশল দেখাইবার সুবিধা পাইলে, তাহার অনুরোধে ঐতিহাসিক সত্যনির্ণয়ের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুল না হইয়া, যথেচ্ছভাবে পদবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হই!

'দ্বাদশনারী'তে রাণী ভবানীর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ স্বাধীন অনুসন্ধানতৎপরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বোধ হয় 'নবনারী'-লেখকের[২] পদানুসরণ করিয়াই 'দ্বাদশনারী' রচিত হইয়া থাকিবে। 'নবনারী'-লেখক বহুদিন রাজসাহী প্রদেশে বসতি করিয়া অনেক জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সবিশেষ সত্যানু-সন্ধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 'নবনারী' এবং 'দ্বাদশনারী', এই উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রামজীবন পরলোকগমন করেন,—তৎকালে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক।" উভয় লেখকেরই এইরূপ ধারণা যে, তৎকালে আলিবর্দী বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব। কিন্তু ইতিহাসপাঠী পাঠশালার বালকেরাও জানে যে, ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে আলিবর্দী সিংহাসনে পদার্পণ করেন নাই;—১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনার শাসনকর্তা, একজন রাজ-কর্মচারী মাত্র!

১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামজীবনের মৃত্যু হয়;—ইহা সত্য হইলেও, তৎকালে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক", এ কথা সত্য হইতে পারে না। ১৭২৪ অথবা ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের অভাবে রামকান্তকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামকান্ত "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক" হইলে, দত্তকগ্রহণের সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম

১৩ বৎসরের ন্যূন হইতে পারে না। 'দ্বাদশনারী'তে লিখিত আছে যে, রামকান্ত যখন "অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক তরুণ যুবক", রাণী ভবানীর তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। এই হিসাবে রাণী ভবানীর বিবাহের সময় লইয়াও বিলক্ষণ বিতর্ক উপস্থিত হয়। অতি শৈশবকালে "গৌরীদান"-প্রথামতে রাণী ভবানীর উদ্বাহকার্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল; 'দ্বাদশনারী'র হিসাবে রামকান্ত তখন একাদশ বৎসরের বালক! রামজীবন কি বিবাহের পর ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক রামকান্তকে সস্ত্রীক দত্তকগ্রহণ করিয়াছিলেন? বয়ঃক্রম-সম্বন্ধে 'দ্বাদশনারী'-রচয়িতা যেরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য বর্ণনার মধ্যেও সেইরূপ ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

রাণী ভবানী বা নাটোর রাজবংশ সম্বন্ধে যত পুস্তকে এই রাজ্যনাশ-কাহিনী লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'দ্বাদশনারী'তেই কল্পনার প্রাবল্য কিছু অতিমাত্রায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, এই লেখক বোধ হয় মিত্র মহাশয়ের সরসবর্ণনার উপর আরও একটু রং চড়াইয়া, স্বরচিত ইতিহাসখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মিত্র মহাশয় রাজসাহীতে ডেপুটী কালেক্টরী করিবার সময়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নানা কারণে দিঘাপতিয়ার রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়। সেই সূত্রে প্রাচীন কর্মচারিদিগের নিকট যে সকল 'গল্পগুজব' শুনিতে পাইয়াছিলেন, মিত্র মহাশয় তাহার একবর্ণও পরিত্যাগ করেন নাই। সুতরাং মিত্র মহাশয়ের সকল কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে।*

* "If Ramkanta had something of the intelligence and fore-sightedness of his wife, he would have succeeded in managing the Raj; but he had not in his whole composition a particle of that strong common sense and clear judgement which distinguished the Maharani Bhabani. He was destitute of the faculty of appreciating the merits of men and he could never distinguish friends from foes. A few months after he succeeded to the Estate, he quarrelled with Dayaram Rai who had been the firm

মিত্র মহাশয়ের বর্ণনালালিত্যে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। যে দেশে ইতিহাসের সমাদর নাই, সে দেশে জনশ্রুতিই একমাত্র সম্বল; সুতরাং বংশপরম্পরায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের অনুকম্পায় অনেক অলৌকিক জনশ্রুতি

---

friend, the trusted adviser and confidential agent of Ramjibana. The Raj *being in arrears* Dayaram remonstrated with the Maharaja *against his* careless management and pointed out to him the necessity and importance of collecting and punctually forwarding the revenue to the Nawab. Ramkanta, being unable to appreciate this disinterested advice, was offended with his outspokenness. He first ceased to be guided by the advice of Dayaram, then ceased to shew common courtsey to him, whom he had been taught by Ramjibana to regard and address as his dada or elder brother and at last he dismissed him from the post of Dewan. Surrounded by a band of flatterers, he was led by them to believe Dayaram to be more an enemy than a friend. Dayaram was astounded and disgusted with this insult and wishing to bring the young Maharaja to his senses, he proceeded to Moorshidabad, where he *represented the real state of things* to the Nawab. Having entire confidence in the Rai Rayan His Excellency deprived Ramkanta of the management of the Raj: and made it over to Deviprasad, the son of Visnuram and nephew of Ramjibana. Ramkanta was helpless and solicited the interference of his quondam Dewan for the restoration to the Raj. Dayaram compassionating the condition of Ramkanta, and specially of his wife, Maharani Bhabani, for whom he had great regard, moved, and with success, the court of Moorshidabad to restore the rightful owner to the Gadi. Dayaram returned to the old post of Dewan after having taught his young master a lesson which he was not in a hurry to forget."—*The Rajas of Rajshahi etc.*

এইরূপে ইতিহাস বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। যাঁহাদের পলিতকেশ, গলিতদন্ত, শিথিলচর্ম বহুদর্শনের পরিচায়ক বলিয়া লোকসমাজে সমাদরলাভ করিয়াছে, তাঁহারা যখন বাষ্পগদগদকণ্ঠে "সেকালের" প্রাচীন কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন সে সকল কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। নীরবে পিতামহীর কাহিনী শুনিবার মত, মধ্যে মধ্যে 'হুঁ' পূরণ করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু মিত্র মহাশয় ইতিহাস লিখিতে বসিয়াও, এই সকল উপকথায় 'হুঁ' পূরণ করিয়া সত্যানুসন্ধানের পথ কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন।

দয়ারামের বাহাদুরি বাড়াইবার জন্য যাঁহারা এই সকল জনশ্রুতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, মিত্র মহাশয় সেই সকল মূল প্রস্রবণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিতে গিয়া, দয়ারামের ধর্মনিষ্ঠ, উদার চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। দয়ারামের ন্যায় প্রভুভক্ত রাজকর্মচারীর পক্ষে এরূপ ব্যবহার করা আদৌ সম্ভব কি না, সে কথার আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। দয়ারাম যেরূপ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান বলিয়া চিরপরিচিত, তাহাতে মুসলমান দরবারের অব্যবস্থিতচিত্ততার কথা তাঁহার নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। একবার মুসলমান নবাব দেবীপ্রসাদকে রাজ্যদান করিলে, আবার যে রামকান্ত পিতৃরাজ্যে অধিকারলাভ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না। দয়ারাম মুসলমান দরবারের রীতিনীতি জানিয়া শুনিয়াও, এরূপ অসমসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইবেন কেন? মিত্র মহাশয় যে সকল কারণে দয়ারামের ক্রোধোদয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। রামকান্ত কেন, কোন রাজাই স্বহস্তে রাজকার্য সম্পাদন করেন না। সুতরাং দয়ারামের ন্যায় বিচক্ষণ রাজকর্মচারী থাকিতে রামকান্ত যে রাজস্বপ্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে রামকান্ত যে একবৎসরও রাজস্বদানে ত্রুটি করেন নাই, এখনও তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ

বিলুপ্ত হয় নাই। এরূপ অবস্থায়, রামকান্তের রাজস্বদানের শিথিলতা উপলক্ষ করিয়া, দয়ারামের যত্নে রামকান্তের রাজ্যনাশ ও বনবাস সংঘটিত হওয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দয়ারামের বিভবের অভাব ছিল না—তিনি মহারাজ রামজীবনের সময় হইতেই তরফ নন্দকুজাদিগরের তালুকদাঁর বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত ছিলেন। রামজীবনের কৃপায় এই তালুক লাভ করিয়া দয়ারাম সবিশেষ কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহা উপভোগ করিতেছিলেন। এই তালুকের রাজস্ব নাটোররাজসংসারে প্রদান করিতে হইত, এবং এই তালুকের অস্তিত্বও সেকালের রীতি অনুসারে নাটোর রাজবাটীর অনুগ্রহের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। সুতরাং দয়ারামের ন্যায় বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী, যে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারই মূলচ্ছেদ করিয়া আপনার হাতে আপনার সর্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করিবেন কেন?

রামকান্তের সম্বন্ধে মিত্র মহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সহিত 'দ্বাদশনারী'র বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। নবাবসরকারের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, রামকান্তের শাসনসময়েই রাজসাহী-রাজ্যের সর্বাপেক্ষা উন্নতি হইয়াছিল। সে রাজ্য সর্বতোভাবে "যবনরাজ্য-ভুক্ত" থাকাই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-প্রবোধের জন্য তাহাকে দিনকতক মাত্র পরের হাতে রাখিয়া, অবশেষে শনৈঃ শনৈঃ "যবনরাজ্যভুক্ত" করিয়া লইবার জন্য আলিবর্দীর এত মস্তিষ্ক কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইবে কেন? নবাবী আমলের গল্পগুজব প্রায়ই অসম্ভব কাহিনী ও 'দ্বাদশনারী'-লেখকের এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণ তাহারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আর একজন লেখক বলেন যে, ১১৫৮ সালের সমসময়ে রায় রাইয়াঁ নন্দকুমারের চক্রান্তে পড়িয়া মহারাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতা হন; কিন্তু তখন তিনি বিধবা।* মিত্র মহাশয় ইহারও উল্লেখ করিয়া

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ—মহিমাচন্দ্র মজুমদার।

গিয়াছেন।* সুতরাং মিত্র মহাশয়ের মতানুসারে রাণী ভবানীর তুইবার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তুইবারই আলিবর্দীর সময়ে। আমরা ইহার কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া আলিবর্দী একবার মাত্র রাণী ভবানীকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন, তাহার পর প্রত্যেক বর্ষেই নবাবদপ্তরে রাণী 'ভবানীর নামজারি দেখিতে পাওয়া যায়।

১১৫৮ সালের সমসময়ে রাণী ভবানীর সবিশেষ গৌরবের অবস্থা। তখন তিনি ভারতবর্ষের বিবিধ পুণ্যক্ষেত্রে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্যপিপাসার পরিচয় দিতেছিলেন। এই সকল মন্দিরফলকে শকাব্দার উল্লেখ আছে। তৎকালে রাজ্যনাশ ও বনবাস সংঘটিত হইলে, এই সকল পুণ্যকীর্তি সংস্থাপিত হইতে পারিত না।

রাজ্যচ্যুত হইলে রাণী ভবানীর আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না! তিনি জগৎশেঠের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, দেওয়ান দয়ারামের সহায়তায় রাজ্যলাভের জন্য নবাব-দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ বিস্তর। কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, আলিবর্দীর শাসন সময়েই এই তুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল! কাহার চক্রান্তে রাণী ভবানীর সর্বনাশ হইয়াছিল, কেবল সেই সম্বন্ধেই যাহা কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপি শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাণী ভবানী মণিমুক্তাপ্রবালাদি অপেক্ষা স্বর্ণালঙ্কারই বহুল পরিমাণে পরিধান করিতেন। ইহাতে অল্পবয়স্কা শেঠকন্যারা কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিত যে, রাণীজী সুবর্ণের ধাতুপাত্র প্রস্তুত না করিয়া, তাহাকে পরম সমাদরে অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন কেন? তৎকালে রাণী ভবানীর এইরূপ দৈন্যদশা যে, রাজ্যোদ্ধারের জন্য যাহা কিছু ব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহার জন্যও অঙ্গের অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিতে হইয়াছিল! এ সকল

* *The Rajas of Rajshahi* etc.

অবশ্যই "গল্পগুজব" ; কিন্তু তথাপি ইহা রাণী ভবানীর বৈধব্যদশার "গল্প-গুজব" নহে।

কুচক্রী দেবীপ্রসাদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়াই যে রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইতে হইয়াছিল, এবং প্রভুভক্ত দয়ারাম ও ক্ষমতাশালী জগৎশেঠের অধ্যবসায়গুণেই যে তাঁহারা নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাপুদেব শাস্ত্রী নামক একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বহু পূর্বে আলিবর্দীর সিংহাসনলাভের কথা গণনা করিয়া দিয়াছিলেন।* এই জনরব সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, আলিবর্দীর সময়ে একজন হিন্দু সাধুপুরুষ এবং তাঁহার শিষ্য নন্দকুমারের সবিশেষ ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছিল। নন্দকুমার অলক্ষিতভাবে ইতিহাসে প্রথম পদার্পণ করেন ; পরে নবাব আলিবর্দীর সময় হইতে গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় পর্যন্ত, বাঙ্গলার ইতিহাস কেবল মহারাজ নন্দকুমারের নামে এবং কার্যবিবরণীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আলিবর্দীর শাসন-সূচনাতে নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারে সবিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার পর নন্দকুমার যখন হুগলীর ফৌজদার, তখন তাঁহার মনস্তুষ্টিসম্পাদনের জন্য ইংরাজ বণিকেরাও তাঁহাকে বৎসরে ২৭০০ টাকা পার্বণী প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন।† এই মহারাজ নন্দকুমারের চক্রান্তেই রাণী ভবানীর সর্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল ; কিন্তু "গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-রচয়িতা মহাশয় তাহার যেরূপ কালনির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। নন্দকুমারের চক্রান্তে রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়া থাকিলে, নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে

* মহারাজা নন্দকুমার—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন।

† **Jams Long,** ***Selections from the Records of the Government of India,*** **Vol. I.**

বাস করিবার সময়েই যে তাহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-রচয়িতা মহাশয় যে কালনির্দেশ করিয়াছেন, তখন নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার, এবং রাণী ভবানী বৈধব্যভারগ্রস্ত—আত্মজীবনে বীতরাগ হইয়া জামাতা রঘুনাথ লাহিড়ীর নামে নবাব-সরকারে রাজসাহী-রাজ্যের নামজারি করিয়াছিলেন!

দেবীপ্রসাদ বহুদিন হইতে যে রাজসাহী-রাজ্যের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, নন্দকুমারের চক্রান্তে সেই রাজসম্পদ প্রাপ্ত হইয়াও দীর্ঘকাল উপভোগ করিবার অবসর পাইলেন না! জগৎশেঠের কল্যাণে রামকান্ত এবং রাণী ভবানী কয়েক মাস পরেই নষ্টরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ রামকান্ত এবং মহারাণী ভবানী দেবী যখন শেঠগৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, জগৎশেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত রাজবাটীর তখন বড়ই গৌরবের অবস্থা। এখনও সেই ধ্বংসাবশিষ্ট ইন্দ্রপুরীকে লোকে 'মহিমাপুর' বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু এখন আর মহিমাপুরের পূর্ব মহিমার লেশমাত্রও বর্তমান নাই। সে বিচিত্র সৌধমালার অধিকাংশই ভাগীরথী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে! এখনও যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আর মানুষের বাসোপযোগী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ভাগ্যবিবর্তনের বিচিত্র শাসনে জগৎশেঠের দীন দরিদ্র বংশাবতংসগণ সেই জরাজীর্ণ রাজপ্রাসাদের কয়েকটি মসীমলিন ভগ্নকক্ষেই কোনরূপে কালাতিপাত করিতেছেন! শেঠ-ভবন বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে গৃহের গুপ্তমন্ত্রণাবলে পলাশীবীর বৃটিশ-বণিক্ কালক্রমে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিনায়কপদে সমারূঢ় হইয়াছেন, সে মন্ত্রভবন এখন নদীগর্ভে, তাহার উপর দিয়া ভাগীরথীর জলস্রোত ধীর মন্থরগতিতে কায়ক্লেশে প্রবাহিত হইতেছে।* যেখানে বাদশাহের মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার আর চিহ্নমাত্রও বর্তমান

* **H. Beveridge, C. S.,** ***A Comprehensive History of India Civil, Military and Social,*** **3 vols, London, 1867.**

নাই ;—ইংরাজবণিক তাহার শেষ ইষ্টকখানিও সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া, মুদ্রাযন্ত্রের সাজসরঞ্জামগুলি কুড়াইয়া লইয়া, অন্যত্র যাতুঘর সুসজ্জিত করিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।* যে গৃহে শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষে বাঙ্গলাদেশের ছোটবড় সকল জমিদারকেই কখন না কখন সসম্ভ্রমে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতে হইত ; যেখানে আবশ্যকমতে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপ মুসলমান নবাবদিগকেও সময়ে সময়ে শুভাগমন করিতে হইত ; যেখানে ঋণগ্রহণের জন্য, অথবা পদাশ্রয়লাভে নবাবের উৎপীড়ন হইতে নিরাপদ হইবার জন্য, জগৎশেঠের কৃপা-কটাক্ষের প্রতীক্ষায় চিন্তাক্লিষ্ট বৃটিশ-বণিক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রহর গণনা করিতেন ; সে সকল ঐতিহাসিক প্রাসাদকক্ষ এখন ধূলিবিলুণ্ঠিত হইতেছে। কয়েকটি জীর্ণ তোরণ, তাহার উপর কতকগুলি তৃণলতা, এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি ইষ্টক ও প্রস্তরস্তূপ ব্যতীত জগৎশেঠের রাজ-বাটীতে এখন আর দেখিবার বস্তু অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার প্রত্যেক জীর্ণ প্রস্তরের সঙ্গে শতবর্ষের গুপ্তকাহিনী এখনও যেন চিরজীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই শেঠভবনে রাজসাহীর রাজ-পরিবারের যেরূপ সমাদর ছিল, তাহাতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া রামকান্ত ও রাণী ভবানী যদি একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়াও জগৎশেঠের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহাতেও সমাদরের ত্রুটি হইত না। তাঁহারা সশরীরে শেঠভবনে সমাগত হইলে, জগৎশেঠ প্রাণপণে তাঁহাদের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইলেন। আলিবর্দীকে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত করিতে যাহা কিছু বিলম্ব হইল। আলিবর্দী অবিলম্বে মূলানুসন্ধান করিয়া আবার রামকান্তকেই রাজসাহী-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

* W. W. Hunter, *Bengal Mss.*

রাণী ভবানী

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সিয়র-উল-মুতাখেরিন-এ আলিবর্দির ব্যক্তিগত চরিত্রের সপ্রশংস উল্লেখ আছে। Orme-এর মতে, **"His private life was very different from the usual manners of a Mahometan prince in Indostan, for he was always extremely temperate, had no pleasures, kept no seraglio, and always lived as the husband of one wife." Quoted in S. C Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. IXXX.**

২. নবনারী—নীলমণি বসাক।

৩. 'পারিষদবর্গের মতামত মেনে নিয়ে নবাব ১১৬৫ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ রানী ভবানীকে সরিয়ে দিয়ে সম্পত্তিতে বহাল করলেন [দেবীপ্রসাদের পুত্র] গৌরীপ্রসাদকে। কিন্তু তাঁকে কোন সনদ দেওয়া হল না, আগে তাঁকে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ দিতে বলা হল। যে কোন কারণে হোক নবাব দরবারে রানী ভবানীর প্রভাব পলাশী যুদ্ধের পরে বেশ কমে গিয়েছিল। ... প্রায় চার মাস পর তিনি [রানী ভবানী] সম্পত্তি ফিরে পেলেন এবং কালবিলম্ব না করে সেই বছরেই অর্থাৎ ১১৬৫ বঙ্গাব্দে রামকৃষ্ণকে দত্তক নিলেন।' বিমলপ্রসাদ রায়, নাটোর রাজ-পরিবারের শরিকানা বিবাদ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯২ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৯২।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজ-দম্পতি

সমতল-ক্ষেত্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর প্রবাহ-বিধৌত বঙ্গভূমি সমধিকরূপে রূপৈশ্বর্যশালিনী বলিয়া বিদেশের লোকে চিরদিনই বাঙ্গালীর অল্পায়াস-লভ্য পর্যাপ্ত অন্নব্যঞ্জনের প্রতি ঈর্ষাকলুষিতনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়োচিত অবসর উপস্থিত হইলে, কেহই এ দেশের ধনধান্য লুণ্ঠন করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এই জন্য একদিন পাঠানসেনা "সোনার বাঙ্গলা" বিপর্যস্ত করিয়াছিল; এই জন্য আবার পাঠানকে সুবর্ণরেখা-পারে চিরনির্বাসিত করিয়া মহারাজ টোডর-মল্ল ও মানসিংহের বীরবাহু বাঙ্গলাদেশে মোগলের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।* মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানী যখন রাজ-সাহী-রাজ্যে পুনরায় অধিকারলাভ করিলেন, তখন হইতে আবার বঙ্গ-ভাগ্যে অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ইতিহাসে ইহারই নাম 'বর্গীর হাঙ্গামা'।

মহারাষ্ট্র-শক্তির অদ্বিতীয় অধিনায়ক ছত্রপতি শিবাজীর দৃষ্টান্ত ও উপদেশ অনুসরণ করিয়া, যাহারা বাহুবলোন্মত্ত বাদশাহ আলমগীরকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, শিবাজীর স্বর্গারোহণের পরে তাহারাই আবার লুণ্ঠনলোলুপ দস্যুদলের ন্যায় ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে আত্ম-শক্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল।[১] ইহাদের উপদ্রবে বাদশাহের মুমূর্ষু শক্তি আরও হীনবল হইয়া পড়িল, ইহাদের লুণ্ঠনযাতনায় ভারত-বর্ষের সমৃদ্ধ জনপদগুলি হাহাকার করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল; অবশেষে বন্যাতরঙ্গতাড়িত জলস্রোতের ন্যায় এই সকল মহারাষ্ট্রবাহিনী "হর হর মহাদেও" রবে সগর্বে বঙ্গভূমির বুকের উপর পিশাচের ন্যায় নৃত্য

* C. Stewart, *History of Bengal.*

করিতে আরম্ভ করিল। গ্রাম, নগর উৎসন্ন হইতে লাগিল, শস্যক্ষেত্র পদদলিত হইতে লাগিল, লোকে প্রাণ লইয়া দূরস্থানে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল;† কেবল নিশিদিন, আজ এখানে কাল সেখানে,—বনে জঙ্গলে, গ্রামে, নগরে, নদীসৈকতে, রাজপথে,—নবাবসেনার সহিত মহারাষ্ট্রসেনার তুমুল সংঘর্ষে বঙ্গভূমি রুধিররঞ্জিত নরকঙ্কালাকীর্ণ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল! নবাব আলিবর্দীর অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় সে প্রতিকূল শক্তির গতিরোধ করিতে পারিল না; রাজধানী মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত লুণ্ঠিত হইয়া গেল!*

বর্গীর হাঙ্গামা বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইয়া পড়িল।† ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ জনপদগুলি জনশূন্য হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজসাহী-রাজ্যের প্রধান রাজধানী বড়নগর এবং তাহার পার্শ্ববর্তী সমুদয় স্থান মহারাষ্ট্রনির্যাতনে জর্জরিত হইয়া উঠিল। রামকান্ত ও রাণী ভবানী রাজসাহী-রাজ্যে অধিকারলাভ করিয়াও এই সকল কারণে নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন করিবার অবসর পাইলেন না।

লোকে দলে দলে ভাগীরথী এবং পদ্মার প্রবল প্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর ও পূর্ববাঙ্গলায় পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্বারোহী মহারাষ্ট্র-সেনার সহিত বাঙ্গালী পদাতিক সেনা কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। অবশেষে নবাবপরিবার নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার জন্য মহাবীর আলিবর্দীও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।* রামকান্ত ও রাণী ভবানী ভাগীরথী-তীরসংলগ্ন বড়নগর রাজবাটীর মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া, নাটোরের

† Despatch to the Court of Directors, 8 January 1752, para 49.

* *Siyar-ul Mutakherin.*

† During the 15 years of Aliverdi's Government or reign, scarcely a year passd free from the ruinous invasions of the Mahrattas.—Mill, *A History of British India*, Vol. III, p. 161.

* C. Stewart, *History of Bengal* etc.

পরিখাবেষ্টিত সুগঠিত রাজবাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; রাজবাটী রক্ষা করিবার জন্য মথুরাবাসী বলিষ্ঠদেহ বীরবংশোদ্ভব রণকুশল সেনাদল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন;* এবং গৃহতাড়িত অনাথ প্রজাপুঞ্জের সকরুণ হাহাকার নিবারণ করিবার জন্য অন্নবস্ত্র ও আবাসগৃহের সংস্থান করিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।†

মহারাষ্ট্র-লুণ্ঠনে রাজসাহী-রাজ্যের একাংশ বিধ্বস্ত হইয়া গেল, রাজকোষ দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, আত্মরক্ষা এবং প্রজাপালনের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত সেনাদল পোষণ করিতে হইল; ইহাতেই মহারাজ রামকান্তের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল! এই মহাবিপ্লবের প্রবল তরঙ্গে নিপতিত না হইলে, মহারাজ রামকান্তও যে সবিশেষ শাসনকৌশল প্রদর্শন করিতে পারিতেন না, তাহা কে বলিতে পারে? এরূপ বিপ্লবের মধ্যে নিশিদিন বিড়ম্বিত হইয়াও, তিনি যতটুকু শাসনকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত যৎসামান্য নহে। পদ্মার উত্তরতীরস্থ রাজসাহী-প্রদেশের লোকে তাঁহার শাসনকৌশলে এই মহাবিপ্লবের মধ্যেও এরূপ অবিচলিতভাবে দিনযাপন করিয়াছিল যে, নবাব আলিবর্দী রামকান্তের রাজ্যমধ্যেই নবাবপরিবারের জন্য নিরাপদ বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। রামপুর বোয়ালিয়ার অনতিদূরবর্তী গোদাগাড়ি গ্রামে এই ঐতিহাসিক নবাব-বাড়ীর সীমাচিহ্ন ও ভগ্নাবশেষ এখনও পড়িয়া রহিয়াছে; এই স্থানের নাম "কেল্লা

---

* রাণী ভবানীর পুররক্ষী মথুরাবাসী সিপাহীসেনাদলের অবস্থিতির জন্য নাটোর রাজবাটীর অন্দরমহলের পার্শ্বদেশে যে সেনানিবাস বা 'বারিক' ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পনে গৃহগুলি ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে!

† বর্ধমান অঞ্চল বর্গীর হাঙ্গামার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। সে অঞ্চলের যে সব লোক আত্মরক্ষার আশায় পৈতৃক স্থান পরিত্যাগ করিয়া রাণী ভবানীর রাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদের বংশপ্রবাহ এখনও রাজসাহী-প্রদেশের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারুইপাড়া।”*

রাজসাহী-প্রদেশ শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের জন্য যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া নবাগত ইউরোপীয় বণিকেরা ইহার স্থানে স্থানে অনেকগুলি বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল কুঠীর কোন কোন পুরাতন অট্টালিকা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামায় এই সকল ইউরোপীয় বণিকদিগকেও সবিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেকালে জলপথেই অধিকাংশ পণ্যদ্রব্য চলাচল করিত; কিন্তু ভাগীরথীতীরে মহারাষ্ট্রসেনা থানা দিয়া বসিয়া থাকিত বলিয়া, লুণ্ঠনভয়ে কেহ সহজে কলিকাতা-অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে স্বীকার করিত না।

ইহাতে শিল্পবাণিজ্যের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইলেও কৃষিপ্রধান রাজসাহী-রাজ্যে কোনরূপ অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং রামকান্তের সময়ে রাজসাহীর অধিকাংশ স্থানের প্রকৃতিপুঞ্জ যে অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নবাবী আমলে রাজকর ব্যতীত অনেকগুলি বাজে জমা প্রদান করিতে হইত। এই বাজে জমার সংখ্যা এবং পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মুর্শিদ কুলীখাঁ এবং সুজা খাঁর আমলেই অধিকাংশ বাজে জমা[২] সংস্থাপিত হয়। আলিবর্দী সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পর, 'আবওয়াব[৩] মন্‌সুরজী' ও "চৌথ মারহাট্টা' নামে কয়েকটি বাজে জমা প্রচলিত হইয়াছিল।† এই সকল বাজে জমা ও বার্ষিক নির্দিষ্ট রাজকর যথাকালে নবাব-সরকারে প্রদান করিতে রামকান্ত কোনদিনই ত্রুটি

* The district contains no fort, except one beloning to the Nawab of Moorshidabad, at Godagaree, which was built in former times as a place of refuge for the Nawab's household, and is now in a most ruinous condition.—*Hamilton's Description of Hindoostan*, Vol. I.

† Grants *Analysis of Finances of Bengal* etc.

করেন নাই। চারিদিকে যখন মহাবিপ্লব, চারিদিকে যখন নিরন্তর হাহাকার, চারিদিকে যখন অন্নাভাব, রাজসাহী-রাজ্যে যে তখনও ধনধান্য লইয়া প্রজাপুঞ্জ পরম সুখে সংসার পালন করিয়া অকাতরে রাজকর প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ইহাই রামকান্তের শাসনগৌরবের উৎকৃষ্ট পরিচয়।

রামকান্ত ও রাণী ভবানী বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারলাভ করিয়াও সাংসারিক জীবনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। রাণী ভবানীর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু দুইটি সন্তানই অকালে পরলোক গমন করায়, রাজদম্পতির পক্ষে সংসার-সম্পদ বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। একমাত্র রাজকুমারী তারা তাঁহাদিগের শোক-সন্তপ্ত রাজপরিবারে সায়াহ্নের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শশিকলার ন্যায় ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইতেছিলেন। এই কন্যারত্নই রাজদম্পতির অপত্যস্নেহের একমাত্র আধার হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকান্ত ও রাণী ভবানী তাঁহাকে আশৈশব পুত্রের ন্যায় পরম স্নেহে লালনপালন করিতে ও বিদ্যাশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। আজকাল এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার হইতেছে, সেকালে স্ত্রীশিক্ষার এরূপ সমাদর ছিল না। কিন্তু তথাপি সেকালের প্রাচীন রাজপরিবারের কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হইত।* স্বাভাবিক স্নেহবশতঃই হউক, আর রাজ-সংসারের মর্য্যাদারক্ষার জন্যই হউক, রাজকুমারী তারা বাল্যকাল হইতেই বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন।

রামকান্ত ও রাণী ভবানী উভয়েই ধর্ম্মানুরাগে বিবিধ পুণ্যকার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বামীর জীবনকালেই রাণী ভবানীর নাম দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ রামকান্তকে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের হয়ত এইরূপ ধারণা যে, রাণী ভবানীর পুণ্যকার্য্যগুলি

* কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত

তাঁহার বৈধব্যদশায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। রামকান্ত স্বয়ং ধর্মানুরাগী না হইলে রাণী ভবানীর পক্ষে রাজপুত্রবধূ হইয়া বহুব্যয়সাধ্য পুণ্যকার্যে হস্তক্ষেপ করা সহজ হইত না। উপর্যুপরি দুইটি পুত্রসন্তানের পরলোকগমনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সংসারে কথঞ্চিৎ বীতরাগ হইয়া পরসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রামকান্ত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে, হয়ত তাঁহার সংসারসুখ আবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, কিন্তু অতি অল্পবয়সে সহসা তাঁহার পরলোকগমনে রাণী ভবানী সংসারসুখে চিরজীবনের জন্য জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইলেন!

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ রামকান্ত সহসা পরলোকগমন করায়, রাণী ভবানী রাজসাহী-রাজ্যের অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী হইলেন।[৪] রাজসাহীর বিস্তৃত জনপদ এবং রাজকুমারী তারা তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। চারিদিকে রাষ্ট্রবিপ্লব—স্বয়ং নবাব আলিবর্দী অসিহস্তে মহারাষ্ট্রদমনে ছুটাছুটি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন, কত প্রতিভাশালী রাজা, জমিদার রাজ্যরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন,—এমন সময়ে রমণী হইয়া, অন্তঃপুরচারিণী হইয়া, রাণী ভবানী কেমন করিয়া রাজসাহীর ন্যায় অর্ধবঙ্গব্যাপী বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিবেন, নবাব আলিবর্দী সে জন্য একবারও চিন্তিত হইলেন না। রাণী ভবানীর উজ্জ্বল প্রতিভার কথা রাজা রামকান্তের জীবিতকালেই চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং নবাব আলিবর্দী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তাঁহাকেই জমিদারী সনন্দ প্রদান করিলেন! সেকালের জমিদারদিগের জীবন-মরণের বিচার-ক্ষমতা ছিল, বাহুবলে রাজ্যরক্ষা করিবার স্বাধীনতা ছিল, এবং আবশ্যকমতে রাজদরবারে উপনীত হইয়া, মন্ত্রণাবলে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিবার দায়িত্ব ছিল। জমিদার সর্বতোভাবে করসংগ্রাহক শাসনকর্তা বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সুতরাং কোন জমিদার নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিলে, তাঁহার বিধবা রমণীর পক্ষে উত্তরাধিকারসূত্রে পরিত্যক্ত রাজসম্পদ ও শাসনক্ষমতা সম্ভোগ করিবার অধিকার ছিল না।

নবাব বাহাদুর যাঁহাকে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাকে শাসনভার সমর্পণ করিয়া পরলোকগত জমিদারের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে, শাসনকৌশলের পরিচয় না পাইলে, আলিবর্দীর ন্যায় প্রবীণ নরপতি যে বিপ্লবময় রাজসাহী-রাজ্য একজন রমণীর শাসনাধীন রাখিতে সম্মত হইতেন না, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রাণী ভবানী যখন রাজসাহী-রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পূর্ণ গৌরবের অবস্থা। বাঙ্গলাদেশ যে একাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আট চাক্‌লায় রাজসাহীর জমিদারী বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রাণী ভবানী মুর্শিদাবাদ, ঘোড়াঘাট, ভূষণা, আকবরনগর, জাহাঙ্গীরনগর, বর্ধমান, যশোহর এবং কড়াইবাড়ী নামক আট চাক্‌লার বিবিধ স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।* এই আট চাক্‌লার মধ্যে কোন কোন চাক্‌লার সমুদায় স্থানই রাণী ভবানীর অধিকারভুক্ত ছিল। এই সকল বহুবিস্তৃত জনপদের রাজকর সংগ্রহ করাই কত কঠিন; তাহার উপর আবার সেকালের রাজবিধির ব্যবস্থানুসারে এই বিস্তৃত রাজ্যের প্রকৃত শাসনভারও রাণী ভবানীর হস্তেই সমর্পিত হইল। সুতরাং বিপ্লবময় যুগে বিধবা হিন্দুরমণীর হস্তে এতগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রদেশের শাসনভার সমর্পিত হইবামাত্র রাণী ভবানীর সকল চিন্তা রাজসাহী-রাজ্যের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি কিরূপ সুকৌশলে সেই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকার্য সম্পাদন করিয়া আপন নাম প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। ইহাতেই তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

রাণী ভবানীর অধিকৃত রাজসাহী-রাজ্যের বর্ণনা করিতে গিয়া একজন সমসাময়িক ইংরাজ লেখক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই বর্ণনানুসারে জানা যায়, "তৎকালে রাণী ভবানীর বার্ষিক দেড়কোটী টাকা আয় ছিল, তাহা হইতে কেবল ৭০ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান করিতে হইত; এবং

* Grant's *Analysis of Finances of Bengal.*

তিলিবংশীয় মন্ত্রীবর দয়ারামের সাহায্যে তিনি সুসংস্থাপিত রাজসাহী রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিতেন।"* এই শাসনভার পরিচালনা করিবার সময়ে রাণী ভবানী যে সকল পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, একালের লোকের পক্ষে তাহার মর্যাদা নির্ণয় করা সহজ নহে। একালে টাকা থাকিলে যাহা সম্ভব হয়, সেকালে টাকা থাকিলেই তাহা সম্ভব হইত না। দেশে পথ ঘাট ছিল না, লোকে দস্যুতস্করের ভয়ে সযত্নসঞ্চিত ধনরত্ন মৃত্তিকাগর্ভে বা ভস্মস্তূপে লুকাইয়া রাখিতে বাধ্য হইত; সর্বত্র বাহুবলের প্রবল প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। সুতরাং জমিদারদিগকে বাহুবলে রাজ্যরক্ষা করিতে হইত, বিচারবলে দুষ্টের দমন করিতে হইত, শাসনকৌশলে শান্তি সংস্থাপন করিতে হইত; এবং এই সকল দুরূহ কার্য সুসম্পন্ন করিতে না পারিলে, কেহই দেশে দেশে পুণ্য-কার্যের প্রতিষ্ঠা করিবার অবসরলাভ করিতেন না। বর্গীর হাঙ্গামায় দেশের মধ্যে তুমুল কোলাহল ও দীর্ঘস্থায়ী অরাজকতা উপস্থিত হইয়া, এই দুষ্কর ব্রত আরও দুষ্কর করিয়া তুলিয়াছিল। রাণী ভবানী সেই ব্রত যেরূপ সুকৌশলে সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া ইতিহাস-লেখক-

* At Nattore, about ten days' travel north east of Calcutta resides the family of the most ancient and opulent of the Hindu princes of Bengal. Raia -Ramkant of the race of Brahmins, who deceased in the year 1748, was succeedcd by his wife, a princess named Bhobanee Ranee, whose Dewan or minister was Dayaram of the Teely caste or tribe; they possess a tract of country about thirty five days travel and under a Settled Government; their stipulated annual rent to the Crown was seventy lakhs of sicca Rupees, the real revenues about one krore and a half"—*J. Z. Holwell, Interesting Historical Events relating to the Provinces of Bengal and the Empiore of Indostan*, 3 parts, London, 1765-71; *Indian Tracts*, London, 1764.

মাত্রেই তাঁহাকে অজস্র সাধুবাদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।* রাণী ভবানীর জীবনকাহিনী আমাদের দেশের অর্দ্ধশতাব্দীর সুখদুঃখের বিস্তৃত কাহিনীর সঙ্গে এরূপভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে, সমসাময়িক ইতিহাসের আলোচনা না করিলে, তাঁহার জীবনকাহিনীর প্রকৃত সৌন্দর্য অনুভব করিবার উপায় নাই। এখন আর সেদিন নাই! এখন আমরা পরাধীন; অন্নবস্ত্রের জন্য, শিক্ষাদীক্ষার জন্য, সুবিচার সুশাসনের জন্য, দেশের অবনতির জন্য, সকল বিষয়ের জন্যই পরমুখাপেক্ষী। রাণী ভবানীর সময়ে যদিও মুসলমান এ দেশের রাজসিংহাসন অধিকার করিতেন, তথাপি সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাঙ্গলাদেশ জমিদারদিগেরই শাসনাধীন ছিল। সে শাসন-কার্যে নবাবের মুখাপেক্ষা করিয়া বাসিয়া থাকিতে হইত না, কিংবা প্রত্যেক শাসনকার্যেই ভয়ে ভয়ে পদসঞ্চালন করিতে হইত না। প্রতিভা-শালিনী রাণী ভবানী সেই জন্য স্বাধীন শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকারলাভ করিয়া আত্মগৌরবে বাঙ্গালী জাতিকেও গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলে, বাঙ্গালী কত সহজে, কত অল্পব্যয়ে, কিরূপ সুকৌশলে রাজ্যশাসন করিয়া প্রজাপুঞ্জের সুখসৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতে সক্ষম, রাণী ভবানীর জীবনকাহিনীই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

আলিবর্দী সামান্য অবস্থা হইতে প্রতিভা ও বাহুবলে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি সে সময়ে সরফরাজের সিংহাসনে আরোহণ না করিতেন, তবে যে মহারাষ্ট্র লুণ্ঠনে এদেশের কত না দুর্গতি হইত, তাহা অনেকেই দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া-

---

* She was the most celebrated personage in the whole family and her administration of the Raj, during the last half of the last century, was memorable.···Maharani Bhabhani was pious, liberal and actively benevolent. She was not slow in performing the duties of her station, as she understood them according to the lights of her age and country.—Kishori Chand Mitra, *The Rajas of Rajshahi* etc.

ছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পরবর্তী ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরাও সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।* আলিবর্দী বুঝিয়াছিলেন যে, কেবল বাহুবলে অথবা সংগ্রামকৌশলে মহারাষ্ট্রসেনার নিষ্ঠুর নির্যাতন হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা অসম্ভব; সেই জন্য তিনি সমুদায় জমিদারদিগের সহিত মিলিত হইয়া, কখন বাহুবলে, কখন মন্ত্রণা-কৌশলে, কখন বা শাসনগুণে দেশরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই জন্য নবাবের সঙ্গে জমিদারদিগের এবং জমিদারদিগের সঙ্গে নবাবের যে স্বাভাবিক স্নেহবন্ধন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতেই আলিবর্দীর সিংহাসন তুমুল সংঘর্ষের মধ্যেও অটল হইয়া রহিল। সেই সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য জমিদারদল সেনাসাহায্য করিয়া, অর্থসাহায্য করিয়া, কেহ কেহ বা যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়াও আলিবর্দীর পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, রাজসাহী-রাজ্যের অধীশ্বরীকে এই কার্যে বিশেষভাবে নবাবের সহায়তা-সাধন করিতে হইত। তজ্জন্য নবাব-দরবারে রাণী ভবানীর নাম বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিল।

আলিবর্দীর পুত্রসন্তান ছিল না,—তিনটি মাত্র কন্যা। তিনি ভ্রাতা হাজি আহ্মদের তিন পুত্র—নওয়াজেস্ মোহমদ, সাইয়েদ আহমদ এবং জয়েনউদ্দীনের সঙ্গে আপন কন্যাত্রয়ের বিবাহ দিয়া, নওয়াজেস্‌কে ঢাকার, সাইয়েদকে পূর্ণিয়ার এবং জয়েনউদ্দীনকে পাটনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং জয়েনউদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র মিরজা মোহম্মদকে উত্তরাধিকারী করিবার জন্য তাঁহাকেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই পোষ্যপুত্রের নাম নবাব সিরাজদ্দৌলা। বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গভূমি যখন নিরতিশয় নির্যাতন সহ্য করিতেছিল, তখন বীরবালক সিরাজদ্দৌলা মাতামহের সঙ্গে অসিহস্তে উড়িষ্যায়, মেদিনীপুরে, বর্দ্ধমানে, বেহারে—নানা স্থানে শত্রুদলন ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন।† সাহসে, সমরকৌশলে, কূটনীতিতে অথবা অদম্য হৃদয়বেগে বালক হইয়াও

* Mill, J., *History of British India*, Vol. III.

† *Siyar-ul-Mutakherin.*

সিরাজদ্দৌলা লোকসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবল মাতামহের অসঙ্গত স্নেহপ্রবণতায় বাল্যজীবনে প্রবৃত্তিদমনের শিক্ষা না পাইয়া, তাঁহার তরুণ হৃদয় অশান্ত ঝটিকার ন্যায় তীব্রতেজে সহসা আলোড়িত হইয়া উঠিত।

সিরাজদ্দৌলার প্রতি আলিবর্দীর আন্তরিক অনুরাগ দেখিয়া, আলিবর্দীর কন্যা বা জামাতাদিগের মধ্যে কেহই আনন্দলাভ করেন নাই। নওয়াজেস এবং সাইয়েদ আহমদ একরূপ প্রকাশ্যভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার ভয়প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং যে সময়ে বহিঃশত্রুর প্রবল প্রতাপে বঙ্গভূমি কম্পিতকলেবরে বর্ষাযাপন করিত, সেই সময়ে রাজধানীতে বসিয়া পাত্রমিত্রগণ এবং প্রধান প্রধান জমিদারদল, কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহার জন্য নানারূপ কলাকৌশল বিস্তার করিতেন। রাণী ভবানী এই গৃহকলহে কোন পক্ষেই যোগদান না করিয়া, নিপুণভাবে রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বাংলায় বর্গীহাঙ্গামার কাল ১৭৪২-১৭৫১ খ্রী.।

২. বাজে জমা—নিজ জমার অতিরিক্ত আয়।

৩. আবওয়াব—cess।

৪. '১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামকান্ত মারা গেলেন। সভাপণ্ডিত ও অন্যান্য অমাত্যবর্গের উপস্থিতিতে মৃত্যুশয্যায় তিনি স্ত্রী ভবানীর হাতে জমিদারির ভার দিয়ে গেলেন এবং দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতিও তাকে দিলেন।' বিমলপ্রসাদ রায়, 'নাটোর রাজ পরিবারের শরিকানা বিবাদ', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯২ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৯২।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হিন্দু-রমণী

রাণী ভবানী বিধবা হিন্দু-রমণী। হিন্দু-রমণী বলিতে অধিকাংশ ইউরোপীয়-গণ যেরূপভাবে নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া আন্তরিক অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করেন না রাণী ভবানীর কীর্তিকলাপ দেখিয়া অনেকেই তাঁহার প্রতি সেরূপ অবজ্ঞা-প্রদর্শনের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। সেকালের ইংরাজ-লেখকেরা বলিতেন যে, "এই হিন্দুরমণীর যশঃপ্রভা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।"* একালের সহৃদয় ইংরাজ-লেখকেরাও বলিয়া থাকেন যে, প্রতিভাগুণে রাণী ভবানী বাঙ্গালীর চক্ষে 'পূজনীয়া দেবী বলিয়া' প্রতিভাত হইয়াছেন।† যে গুণে অন্তঃপুরবাসিনী বিধবা হিন্দু-রমণী ভবানী স্বদেশে বিদেশে ইতিহাসলেখকদিগের নিকট এতদূর সমাদরলাভ করিয়াছিলেন, যে গুণে রাণী ভবানী হিন্দুনরনারীর নিকট প্রাতঃস্মরণীয়া, পূজনীয়া দেবী বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, যে গুণে রাণী ভবানী স্বদেশপ্রেমিকদিগের নিকট মূর্তিমতী মহাদেবী বলিয়া জয়মাল্য উপহার প্রাপ্ত হইতেছেন, যে গুণে রাণী ভবানী স্বদেশের প্রতিভাশালী নবীন কবির কল্পনা-প্রবাহে অমৃতধারা সঞ্চারিত করিয়া দিবার শক্তিলাভ করিয়াছেন, মানবসমাজ সকল যুগে, সকল দেশেই সেই সদ্‌গুণরাশির নিকট করযোড়ে প্রণিপাত করিয়া থাকে। যদিও এ দেশের আর সে দিন নাই, যদিও সেকালের পুরাতন আদর্শ অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, যদিও এখনকার লোকের পক্ষে, সেকালের ক্রিয়াকলাপের গূঢ় মর্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, তাহার দোষ-গুণ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি এখনকার লোকের নিকটেও রাণী ভবানীর পুণ্য নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে!

* Holwell. *Indian Tracts*, London, 1764.

† 'Rani Bhabani is a heroine among the Bengalees'.—H. Beveridge. C. S.

এখনও এ দেশের বহুশত নরনারী প্রত্যূষে ভক্তিভরে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম স্মরণ করিয়া দিন সফল হইল বলিয়া আনন্দ অনুভব করে!

সকল দেশেই এমন তুই চারিটি ঐতিহাসিক চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সহিত দেশের লোকের হৃদয়-মনের বৈদ্যুতিক আকর্ষণ সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কি সিংহাসনারূঢ় রাজাধিরাজ, কি পর্ণকুটীর-বাসী দরিদ্র কৃষক, সকলেই সেই পুণ্য নামে সমভাবে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসচর্চায় আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি রাণী ভবানী বাঙ্গালীর অলিখিত ইতিহাসের সেইরূপ ঐতিহাসিক চরিত্র! বাঙ্গালী যে দিন স্বদেশপ্রেমে বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া দৃঢ়পদে উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে, সে দিনেও তাহার পথ-প্রদর্শক-পতাকাশীর্ষে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম উজ্জ্বল অক্ষরে নরনারীর হৃদয়মন আকর্ষণ করিতে নিরস্ত হইবে না!

সাহস, সত্যনিষ্ঠা, পরহিতাকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশপ্রেম যেমন জাতি-বিশেষের গৌরবের বস্তু, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহাদের সেইরূপ গৌরব। যে সাহসী সত্যপরায়ণ, পরহিতকারী স্বদেশ-প্রেমিক, তাহার নামে সকল দেশেই জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। সে যদি দীন হীন কাঙ্গাল হয়, তথাপি অনেক মুকুটমণিপরিহিত রাজচক্রবর্তী অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকে। তাহাকে চিনিবার জন্য, তাহার দিকে লোক-চিত্ত আকৃষ্ট করিবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার আবশ্যক হয় না—জনসাধারণ স্বভাবতঃই তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাণী ভবানী রমণী হইয়াও এই সকল চরিত্রগুণে বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা পালন করিবার জন্য ক্ষণকালও ইতস্ততঃ করেন নাই। সত্যনিষ্ঠা হেতু তাঁহার জীবনে সৎসাহস এরূপ সুন্দরভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়া-ছিল? সমসাময়িক রাজা, প্রজা, সকলেই তাহার জন্য রাণী ভবানীর নিকট অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান হইতেন। সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে এক শ্রেণীর

উচ্চাভিমানের নিত্যসংস্রব ;—তিনি সেই উচ্চাভিমানের পূর্ণগৌরবে আত্ম-হৃদয়ের উন্নত মহিমায় আপনাতে আপনি এমন উজ্জ্বলভাবে সমাজের সম্মুখে দেবীমূর্তিতে দণ্ডায়মান ছিলেন যে, তাঁহাকে হারাইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় মন্দির যেন সত্যসত্যই অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে !

বাঙ্গালীর ইতিহাসে রাণী ভবানীর ন্যায় দেবী-চরিত্র বড়ই দুর্লভ। তাঁহার জীবনলীলা যখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে আর একজন হিন্দু-মহিলা ধীরে ধীরে প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া উঠিতেছিলেন। তীর্থযাত্রী হিন্দু নর-নারী গয়াধামের দেবমন্দিরদ্বারে ভক্তি, বিস্ময়ে প্রণি-পাত করিবার সময়ে, এখনও সেই পবিত্রব্রতধারিণী অহল্যারাণীর[১] কথা স্মরণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। একজন চিন্তাশীল লেখক ইঁহার কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করিয়া যে সকল সমালোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, রাণী ভবানীর সম্বন্ধেও তাহার প্রত্যেক কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই হিন্দুমহিলা যেরূপ চরিত্রগৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সকল যুগ ও সকল দেশকেই গৌরবমণ্ডিত করিতে পারিত। সত্য বটে, সীতা সাবিত্রী অথবা কুন্তী দ্রৌপদী হিন্দুসমাজের সমাদর ও পূজালাভ করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়া-ছেন ; কিন্তু ইহাও সত্য যে, প্রতিভাশালী অমর কবিকুলতিলকদিগের বর্ণনা-লালিত্যের সহিত অবতারবাদের গুপ্ত বিশ্বাস মিলিত হইয়া, এই সকল হিন্দুরমণীর কীর্তিকাহিনী আরও অমৃতময় করিয়া তুলিয়াছে। মহারাষ্ট্র-কুলমহিলা অহল্যারাণী দেবতা বা দেবাবতার ছিলেন না। তিনি মানুষ হইয়া যেরূপভাবে দেবহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া নীরবে ইহলোক হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশীয়গণ আজিও সেই দেবী-চরিত্রের সমুজ্জ্বল চিত্রপট লোকচক্ষুর নিকট উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই !"*

রাণী ভবানীও অনেকদিন হইল লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন।

* *Calcutta Review.*

আমাদিগের নিকট তাঁহার জীবন-কাহিনী ক্রমেই অলৌকিক উপন্যাসের কল্পনা-কুসুমে পরিণত হইতেছে ; ইতিহাসের অভাবে অল্প দিনের মধ্যেই কত অদ্ভুত জনশ্রুতি মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপে এ দেশের অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র ধীরে ধীরে জনশ্রুতিমাত্রে পর্যবসিত হইতেছে। এখন আমরা সে সকল ভিত্তিহীন জনশ্রুতিতে আস্থাস্থাপন করিতে সাহস না পাইয়া, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকেও স্বকপোল-কল্পিত উপন্যাস মনে করিয়া আশানুরূপ সমাদর প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি। আমাদিগের এইরূপ বিড়ম্বনা দর্শন করিয়া, একজন ইংরাজলেখক লিখিয়া গিয়াছেন, "দুঃখের কথা আর কি বলিব ? ইংলণ্ডের প্রত্যেক পল্লীর ইতিহাস আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ভাগ্যে সমগ্র ইংলণ্ড অপেক্ষা বৃহত্তর জনপদেরও কোনরূপ ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না !"* বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বলিয়াই রাণী ভবানীর জীবনী নূতন করিয়া সঙ্কলন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর যদি সযত্নগ্রথিত স্বদেশের ইতিহাস থাকিত, তবে তাহার অর্দ্ধ শতাব্দীর অতীতকাহিনীর প্রত্যেক প্রধান ঘটনার সঙ্গে রাণী ভবানীর পুণ্য নাম জড়িত হইয়া থাকিত ; তাঁহার কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করিবার জন্য স্বতন্ত্র জীবনী সঙ্কলন করিবার আবশ্যক হইত না।

রাণী ভবানী যে যুগে জন্মগ্রহণ[২] করেন, সে যুগ মুসলমান নবাবদিগের প্রবল প্রতাপের অলৌকিক কাহিনীপরিপূর্ণ রহস্যময় তামস যুগ বলিয়া ইংরাজের ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও, সেকালে এদেশের সকল স্থানেই হিন্দুজমিদারদিগের আত্মশাসনগৌরব উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য হিন্দু রীতি নীতি, হিন্দু আচার ব্যবহার, হিন্দু পরহিতাকাঙ্ক্ষার পবিত্র নিদর্শনগুলি কিছুমাত্র বিলুপ্ত হয় নাই। ভবানী আত্মারাম চৌধুরীর এক-

* "Every country, almost every parish in England, has its annals ; but in India, vast provinces, greater in extent than the British Islands, have no individual history whatever !"—*Sir W. W. Hunter.*

মাত্র স্নেহময়ী দুহিতা—আত্মারামের সৌধ-বিভূষিত সৌভাগ্যসম্পদের একমাত্র আশালতা। সুতরাং আশৈশব পরম স্নেহে লালিত পালিত হইয়া, ভবানী বাল্যজীবনেই পিতার সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে শিখিয়াছিলেন। পিতৃগৃহে যে সকল অনাহূত পথশ্রান্ত বিপন্ন পথিকগণ প্রতিদিন অকাতরে অন্নপানীয় পাইত, পিতৃগৃহের সুমার্জিত দেবমন্দিরে শঙ্খঘণ্টানিনাদমুখরিত মন্ত্রোচারণে যে সকল দেবদেবীর সেবাপূজা প্রতিদিন পরম সমারোহে নির্বাহিত হইত, তাহা বালিকাহৃদয়ে এমন চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল যে, উত্তর কালে অতুল সম্পদের অধিকারিণী হইয়া, রাণী ভবানী পিতৃগৃহের ন্যায় সমগ্র বঙ্গভূমিকে সেই মহোৎসবের রসাস্বাদন করাইবার জন্য দেশে দেশে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পূজাব্যপদেশে অকাতরে সর্বজীবে অন্নদানার্থ রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন!

অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী দীনপালিনী রাণী ভবানী যেরূপ সগৌরবে অর্দ্ধশতাব্দীকাল[৩] রাজ্যশাসন করিয়াছেন, পরহিতাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণকামনায় যে সকল সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন স্বধর্মানুরাগের বশবর্তিনী হইয়া দেশে দেশে যে সকল দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, লোকহিতব্রতে অগ্রসর হইয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া যে সকল অক্ষয় কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ কাল সহকারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু এখনও যাহা সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহাও এত বহুবিস্তৃত যে, তাহাতেই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়া যায়।

বাঙ্গালাদেশে নদনদীখালবিলের অভাব নাই। বরং বর্ষাকালের অপরিসীম জলপ্লাবনে অধিকাংশ স্থানেই লোকের বাড়ীঘর, পথঘাট জলমগ্ন হইয়া যায়! কিন্তু এ দেশের এমনই অদৃষ্টবিড়ম্বনা যে, সেই সকল পল্লীতে পল্লীতে গ্রীষ্মকালের নিদারুণ জলকষ্টে পল্লীবাসিগণ হাহাকার করিতে থাকে! বাঙ্গলাদেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; বাঙ্গালীজাতি কৃষিপ্রধান জাতি;—জল ভিন্ন বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা নির্বাহ করা যে কত

দূর অসম্ভব, তাহা বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না। বাঙ্গালীর জলদৈন্য দূর করিবার জন্য যাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট তাঁহাদের পুণ্য নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। রাণী ভবানীর যে সকল পুণ্যকীর্তি এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তন্মধ্যে তাঁহার জলাশয়গুলিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া ধূলি-বিলুণ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার সংস্থাপিত অনেক অতিথিশালার ভিত্তিমূল পর্যন্তও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বহুব্যয়নির্মিত অনেক রাজপথ কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় লোক-চলাচল রহিত হইয়া গিয়াছে ;—কিন্তু তিনি যে সকল দীর্ঘিকা ও সরোবর খনন করাইয়া দিয়া দরিদ্রের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহার স্বচ্ছ সলিলে তাঁহার পুণ্যকীর্তি এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে! তিনি কোথায় কত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন, পরোক্ষভাবে কত স্থানে জলাশয়খননের উৎসাহদান করিয়াছিলেন, এখন আর তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। একবার দুর্ভিক্ষসময়ে রাঢ়দেশের দুর্দশার অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবার জন্য স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[৪] গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রতাপে অশ্বারোহণে দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, যেখানেই এক একটি প্রসন্নসলিলা বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা দেখিয়া জলদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেখানেই লোকে দুই হাত তুলিয়া রাণী ভবানীর নাম করিয়া আশীর্বাদ করিয়াছে। কেহ যদি এখনও পুরাতন রাজসাহী-রাজ্যের সকল স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারেন, তবে এইরূপ শত শত জলদানব্রতের কীর্তিস্তম্ভে রাণী ভবানীর সহৃদয় শাসননীতির পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

আজকাল এ দেশে গমনাগমনের পথ সহজ হইয়াছে। সেকালে প্রধান প্রধান স্থানে যাতায়াত করিবারও সুবিধা ছিল না। যে দুই চারিটি পথঘাট ছিল, তাহাতেও লোকে নিঃশঙ্কচিত্তে গমনাগমন করিতে সাহস পাইত না। দূরদেশে গমন করিতে হইলে হয় পথক্লেশে, না হয় দস্যুহস্তে, শীঘ্রই ভ্রমণকার্য সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিত। পথিমধ্যে পথিকদিগের বিশ্রামের

জন্য কোনরূপ আশ্রয়স্থান ছিল না। ইহাতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের যেরূপ ক্ষতি হইত, তীর্থযাত্রীদিগকে ততোধিক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত। নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁ বাহাদুর রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে হুগলী পর্যন্ত রাজপথপার্শ্বে স্থানে স্থানে অনেকগুলি প্রহরীমন্দির ও পান্থশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাণী ভবানীও তদনুরূপ কতকগুলি রাজপথ ও পান্থশালা নির্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রী হিন্দুদিগের তীর্থক্লেশ অনেক পরিমাণে দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজসাহী-প্রদেশে রাণী ভবানীর একটি রাজপথ ও সেতু এখনও বর্তমান আছে; তাহার নাম 'ভবানী জাঙ্গাল'। এই পথের বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্থানে স্থানে জলাশয় এবং জলাশয়-তীরে পথিপার্শ্বে প্রস্তরনির্মিত ভোজনপাত্র, পানপাত্র ও রন্ধনস্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে; পথিকগণ অনায়াসে সেখানে আসিয়া স্নানাহার সম্পাদন করিতে পারিতেন। দেখিলেই মনে হয় যে, সেই পুরাতন রাজপথগাত্রে এখনও যেন করুণারূপিণী রাণী ভবানীর সরল সুন্দর সৌম্যমূর্তি চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে[৫]।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. অহল্যা বাঈ—ইনি ছিলেন মারাঠা নায়ক মলহর রাও হোলকারের পুত্রবধু এবং খাণ্ডে রাও-এর পত্নী। পর পর স্বামী ও শ্বশুরের মৃত্যুর পর ইনি হোলকার রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন (মৃত্যু ১৭৯৫ খ্রী.)। "She was one of the most exemplary rulers that ever ruled and is still remembered for many benevolent works and temples that she built in different parts of India. The high road from Calcutta to Benares, the temple of Annapurna at Benares and that of Vishnu at Gaya were all built by her. (*Proceedings of Indian Historical Records Commission*, December 1930)

২. রানী ভবানীর জন্মকাল আনুমানিক ১১২১ বঙ্গাব্দ।

৩. স্বামী রামকান্তের পরলোক প্রাপ্তির পর ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রানী ভবানী স্বহস্তে রাজশাহী জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রানী ভবানী তাঁহার দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের অনুকূলে জমিদারীর শাসনভার পরিত্যাগ করেন।

৪. প্রসিদ্ধ বাগ্মী, রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫)।

৫. রানী ভবানী "১৭৫৩ খ্রীঃ কাশীধামে ভবানীশ্বর শিব স্থাপন করেন। কাশীর বিখ্যাত দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড এবং 'কুরুক্ষেত্রতলা' নামে জলাশয় তাঁরই কীর্তি। তিনি হাওড়া শহর থেকে কাশীধাম পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। সেই প্রাচীন রাস্তাটি বর্তমানে বম্বে রোডের অংশবিশেষ। হাওড়া অঞ্চলে প্রাচীনেরা এটিকে রাণী ভবানী রোড বা বেনারস রোড বলে উল্লেখ করেন। বড়নগরে তাঁর নির্মিত ১০০টি শিব-মন্দিরের ৪/৫টি এখনও বর্তমান। মন্দিরগাত্রে এক ধরনের সুষমামণ্ডিত টেরাকোটা শিল্প উৎকীর্ণ যা বর্তমানে বিরল।" (সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পুণ্যকীর্তি

রাণী ভবানী যখন তীর্থভ্রমণোপলক্ষে কাশীধামে গমন করেন, তখন আর তাহাকে পুরাণ-বর্ণিত আনন্দনগরী বলিয়া চিনিয়া লইবার উপায় ছিল না। ধর্মান্ধ আরঙ্গজীবের কঠোর শাসনে সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, দেবমন্দিরগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, বিশ্বেশ্বরের মন্দির পর্যন্তও মুসলমানের মস্‌জেদে পরিণত হইয়াছিল ![১] উপযুক্ত আবাসগৃহের অভাবে তীর্থযাত্রীদিগের ক্লেশের অবধি ছিল না ; হিন্দুদিগের পক্ষে সে দৃশ্য স্বভাবতঃই হৃদয়বিদারক হইয়া উঠিয়াছিল।

কাশীধামের পুণ্যক্ষেত্র এরণ্ডপত্রাকৃতি ; সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সীমাচিহ্ন সংস্থাপন না করিলে, কোন্ কোন্ স্থান পুণ্যক্ষেত্র, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। রাণী ভবানী এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বহুব্যয়ে কাশীধামের লুপ্তোদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছিলেন।[২] তাঁহার কল্যাণে আবার সীমাচিহ্ন নির্দিষ্ট হইল ; আবার বহুশত মন্দিরচূড়ায় কাশীর পূর্বগৌরব বিকশিত হইয়া উঠিল ; আবার শঙ্খঘণ্টানিনাদে পুণ্যভূমি মুখরিত হইল।

এই কার্যে কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই ; পদে পদে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই ; কত দিনের অধ্যবসায়ে এই মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

প্রচুর অর্থব্যয় করিতে পারিলে অন্য লোকেও ইহা সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন। কিন্তু কাশীর লুপ্তোদ্ধার করিয়া রাণী ভবানী তাহার সর্বত্র আত্মহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য যে সকল অভিনব কীর্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, অন্য লোকের হৃদয়ে তাহা হয়ত আদৌ উদিত হইত না।

রাণী ভবানীর প্রত্যেক পুণ্যকীর্তিতেই তাঁহার বিশেষত্ব প্রকটিত

হইয়াছিল; অন্য লোকে অর্থবলে যাহার সম্পাদন করিতে পারিতেন, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতেন না; তিনি প্রত্যেক কার্যের মধ্যেই এমন কিছু নূতনত্বের পরিচয় প্রদান করিতেন যে, লোকে দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিত। সেগুলি তাঁহার বিশেষত্বসূচক; তাহাতে তাঁহার জীবহিতব্রতের পরিচয় প্রকাশিত হইত। কাশীধামের লুপ্তোদ্ধার কার্যেও তাহাই হইয়াছিল।

তিনি কাশীর সীমাচিহ্ন সংস্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানে "এক এক ধর্মঢোকা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঐ ঐ স্থানে এক এক পিল্লা,[৩] এক এক বৃক্ষ ও এক এক কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত লোক বা যাহারা আপন মস্তকে দ্রব্যাদি বহন করিত, তাহারা শ্রান্ত বা পিপাসাযুক্ত হইলে বিনা সাহায্যে ঢোকার উপর মোট বা দ্রব্যাদি রাখিয়া বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম এবং জলপানাদি করিত, পরে ঢোকার উপর হইতে অক্লেশে মোট আপন মস্তকে লইয়া পুনর্বার গমন করিত।"*

অন্তঃপুরবাসিনী রাজরাণী হইয়াও যাঁহার কোমল হৃদয় ভারবাহী দীন-দরিদ্রের দুঃখকষ্টে বিগলিত হইত, কাশীবাসিগণ যে অদ্যাপি অন্নপূর্ণার অবতার বলিয়া প্রাতরুত্থানসময়ে তাঁহার গুণানুকীর্তন করিয়া থাকেন, ইহাই রাণী ভবানীর অবিনশ্বর স্মৃতিচিহ্ন।

একজন চরিতাখ্যায়ক এই সকল কথার উল্লেখসময়ে লিখিয়া গিয়াছেন,

"নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরের চৌব্বাতে আট মণ ছোলা ভিজান যাইত, তাহা অনাহূত যে সকল লোক আগত হইত, তাহাদিগকে দেওয়া যাইত এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য ২৫ মণ তণ্ডুল বিতরণ হইত।"

সাঁতোল-নিবাসিনী রাণী সর্বাণী করতোয়াতটে যে মহাপীঠের আবিষ্কার করেন, তদ্দর্শনার্থ বহু শত যাত্রী সমবেত হইত। পথঘাটের সুব্যবস্থা না

* নবনারী, নীলমণি বসাক

থাকায় লোকের যথেষ্ট কষ্ট হইত; রাণী ভবানী সে কষ্ট দূর করিয়া তীর্থ-দর্শনের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সীতারামের দেবমন্দিরগুলির জীর্ণসংস্কার করিয়া তথায় যথারীতি সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যকৃত প্রাচীন কীর্তিরক্ষার জন্য তাঁহার যেরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল, হিন্দুসাধারণের সেরূপ অনুরাগ থাকিলে রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্তি এত অল্পদিনের মধ্যেই এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত না।

অর্ধবঙ্গব্যাপী রাজসাহী-রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও রাণী ভবানী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। কখনও নাটোর রাজবাটীতে, কখনও পুণ্যতীর্থে, কখনও বা বড়নগরের গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া, রাজকার্য পরিদর্শন, পুরাণাদিশ্রবণ, সন্ধ্যাবন্দনাদিসম্পাদন ও লোক-হিত-সাধনে দিনযাপন করিতেন। তাঁহার হবিষ্যান্নের জন্য উড়ি ধান্য ভিন্ন কৃষিজাত ধান্য ব্যবহৃত হইত না। একজন হিন্দু কবি এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অতিপুণ্যবতী রাজ্ঞী কুশাসনবিলাসিনী।
ব্রীহ্যন্ননিয়তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী॥"*

যে সময়ে প্রাচীন রাজবংশের উত্তরাধিকারিগণ যথাকালে রাজস্বদানে অশক্ত হইয়া নবাব-দরবারে নানারূপে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন, সেই সময়ে বর্ষে বর্ষে বহুলক্ষ মুদ্রা রাজকর পরিশোধ করিয়া এই সকল বহুব্যয়সাধ্য পুণ্যকার্য সংস্থাপন করায়, রাণী ভবানীর শাসন-প্রতিভা সকলের নিকটেই বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল কীর্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া একজন সহৃদয় ইংরেজ রাজ-পুরুষ লিখিয়া গিয়াছেন;—

"রাণী ভবানী পুণ্যশীলা ও ধর্মপরায়ণা বলিয়া সবিশেষ পরিচিতা। তিনি সর্বদাই দেবসেবা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন; একমাত্র কাশীধামেই তিনশত দেবমন্দির, অতিথিশালা ও ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত তাহার অনেকগুলি

* লঘুভারতম্।

রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, অনেকগুলি এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না;—হয়ত বিস্তীর্ণ রাজ্য হস্তচ্যুত হইলে রাণী ভবানীর বংশধরগণ অর্থাভাবে সেগুলির রক্ষা করিতে পারেন নাই! রাণী ভবানী এই সকল সেবাপূজার জন্য অর্থ ও ভূমিদান করিয়া গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কতক-গুলি নাটোরে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামরায়ের সেবা এখনও মুর্শিদাবাদ প্রদেশে সর্বজনপরিচিত। ইহার জন্য রাণী ভবানী যে ভূমি-দান করেন তন্মধ্যে চুয়াগাছা ও কালীগঞ্জের মধ্যবর্তী ডিহি ফুলবাড়িয়া সর্বপ্রধান।"*

কাশীধামের পুণ্যকীর্তির আর সেরূপ নাই;—একদিন কাশীধামে রাণী ভবানীর ছত্রই সর্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কেবল তাহার ধ্বংসাবশেষমাত্রই বর্তমান;—পূর্বগৌরব অতীতকাহিনীমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ প্রদেশের পুণ্যকীর্তিগুলিও কালক্রমে পূর্বগৌরবচূড়া হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। যে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবাপূজা ইংরাজ রাজপুরুষেরও বিস্ময়োদ্দীপন করিয়াছিল, তাহার জন্য রাণী ভবানী যে সহস্র-বিঘা-পরিমিত শস্যবহুলা সফলা ভূমি সম্প্রদান কয়িয়াছিলেন, এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই অতীত-সাক্ষী দানপত্রখানি উদ্ধৃত হইত।

"শ্রীযুতশ্যামসুন্দরদেবচরণসরসীরুহরাজেষুসেবার্থদবোত্তর পত্রমিদং।"
"নিজ সুকৃতীবিধাত্রী লিখ্যতে দানপত্রী শাকে ১৬৮৩ সনে ১১৬৮ বর্ষে লিখনং কার্য্যনঞ্চাদৌ পরন্তু মদীয়রাজ্যৈকদেশে রাজসাহীপরগণাখ্যে গ্রামাণ্যন্তর্গতপরগণে গোহাসেতিদ্ধরাজ্যোপদেশে একসহস্রবিঘেতি-লৌকিকপ্রসিদ্ধা শস্যসম্প্রদানভূমিঃ॥"

"দেবস্য হারিণো যে চ যে চ তদ্বিঘ্নকারকাঃ।
নরকান্নিষ্কৃতিস্তেষাং নাস্তি কল্পশতৈরপি॥"

ইংরাজাধিকার প্রচলিত হইয়া কালক্রমে রাজবিধির বিচারানুষ্ঠানে

* Westland's *Report on Jessore.*

রাণী ভবানীর প্রদত্ত অনেক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির কর ধার্য হইয়াছিল। মূল দানপত্রগুলি যথাকালে প্রকাশিত ও প্রমাণীকৃত না হওয়ায়, অনেকস্থলে এইরূপ বিচারবিভ্রাট সংঘটিত হইয়াছিল। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যও অনেক কাগজপত্র লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। যে সকল দেবোত্তরভূমি এখনও প্রচলিত আছে, তাহারও সমস্তগুলির দানপত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজসাহীর কালেক্টারীতে কতকগুলির অনুলিপি আছে; মূল দানপত্র কি হইল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।*

রাণী ভবানীর ভূমিদানপত্রের সংখ্যানির্ণয় অসম্ভব; তিনি যে বহুলক্ষ বিঘা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল দানপত্রে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত শ্লোকাবলী লিখিত থাকিত,—

"বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেতু বসুন্ধরাং।
স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥"

---

* রাজসাহীর কালেক্টারীতে যে সকল অনুলিপি রক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই-গুলি প্রধান;—যথা;—

১১৬২। ২৫ কার্তিক রাধাকান্ত দেব ঠাকুর ১০০০ বিঘা।
১১৬৫। ১ শ্রাবণ কানাইয়ালাল দেব ঠাকুর ২০০০ বিঘা।
১১৬৭। ২২ মাঘ মদনমোহন দেব ঠাকুর ১০০০ বিঘা।
১১৬৮। ২৪ আশ্বিন গোপীনাথ দেব ঠাকুর ১৭৫০ বিঘা।
১১৬৮। ২২ চৈত্র শ্যামসুন্দর দেব ঠাকুর ৩০০০ বিঘা।
১১৬৯। ১৫ কার্তিক লক্ষ্মীজনার্দন দেব ঠাকুর ৫০০ বিঘা।
১১৭০। ৮ পৌষ লক্ষ্মীজনার্দন দেব ঠাকুর ৫০০ বিঘা।
১১৭১। ১৫ ভাদ্র মনোমোহন দেব ঠাকুর ১২৫০ বিঘা।

রাণী ভবানী সাদরে শাস্ত্রানুশাসনবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দানপত্র লিখিয়া দিতেন; উত্তরকালে তাহার মর্যাদা সকল স্থলে সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হয় নাই বলিয়া রাণী ভবানীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

রাণী ভবানীর এই সকল পুণ্যকীর্তির মর্যাদানিরূপণ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। লোকে গৌরবলালসায়, বা স্বধর্মানুরাগে বা স্বদেশপ্রীতিতে প্রণোদিত হইয়াই এই শ্রেণীর পুণ্যকীর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে; রাণী ভবানীর পুণ্যকীর্তিগুলি ইহার কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহার আলোচনা না করিলে আমরা তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিব না।

অনেকে গৌরবলালসায় উত্তেজিত হইয়া লোকপ্রশংসা বা রাজদত্ত-উপাধি-লাভাশায় অনেক পুণ্যকীর্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর দান একেবারেই নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহার সহিত খ্যাতিলাভ-গণনার সংস্রব থাকায়, ইহাতে দাতার মহোচ্চহৃদয়ের পরিচয় প্রকাশিত হয় না। যাঁহারা উপাধিলাভের পূর্বে গ্রামে গ্রামে দীনদরিদ্রদিগকে অন্ন-জল বিতরণ করিয়া গলদ্‌ঘর্মকলেবরে আত্মকার্যের ঢক্কানিনাদ করিতেছেন. উপাধিলাভ করিবামাত্র তাঁহারাই যে আবার দীনদুঃখীদিগকে রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিতেও কাতর হন না,—এরূপ দৃষ্টান্ত এ হতভাগ্য দেশে বিরল নহে। যে বিষয়ে দান করিলে রাজার শুভদৃষ্টিলাভের পথ সহজ হইবে, সেই বিষয়ে দান করিবার জন্যই ইঁহাদের সমধিক আগ্রহ। নিজের বাস-গ্রামের কাঙ্গাল প্রতিবেশিগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে, তাহাদের করুণ ক্রন্দন নিত্যই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, অথচ ধনকুবের গ্রাম-বাসী বড়লোক মহাশয় শৈলশিখরবিহারী বিলাসিগণের বিশ্রামভবন-নির্মাণের জন্য সমুদয় সহৃদয়তা ফুরাইয়া ফেলিতেছেন,—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। রাণী ভবানীর দানশীলতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল না।

তাঁহার দানশীলতার সহিত ক্ষতিলাভগণনার সংস্রব ছিল না বলিয়া তাহা উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া চতুর্দিক শীতল করিয়া দিত। স্বদেশ-প্রেমিকের জীবন নিষ্কাম সেবকের জীবন। তিনি স্বদেশকে এমন প্রণয়ে

স্নেহে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসিতে জানেন যে, তাহাতে তাঁহার প্রত্যেক কার্যই মধুময় হইয়া যায়। রাণী ভবানীর পুণ্যকার্যের মূলে স্বদেশপ্রীতি বর্তমান থাকায় তাহার আলোচনামাত্রও আমাদের নিকট মধুময় বলিয়া বোধ হয়।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. On April 9, 1669. Emperor Aurangzeb "issued general order for demolishing all Hindu schools and temples and putting down all their religious teachings and practices. All Hindu fairs and ceremonies were forcibly banned. The famous temple of Kasi Visvesvar was pulled down in 1669 and that of Keshab Rai in 1670···New grand mosques arose on the sites of both the temples which stand to this day, visible for miles as one travels to Banaras and Mathura". History and Culture of the Indian People. *The Mughal Empire*, Vol. VIII p. 265.

২. কথিত আছে, একমাত্র কাশীধামেই রানী ভবানী ৩৮০টি দেবমন্দিরের নির্মাণ ও সংস্কার সাধন করেন। নাটোরের রাণী ভবানী, প্রতিভারঞ্জন মৈত্র, লেখক সমাবেশ, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯০ দ্রষ্টব্য।

"সরকারী নথিপত্র থেকে আভাস মিলছে যে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষ জীবনে তিনি (রাণী ভবানী) কাশীবাসী হতে চেয়েছিলেন এবং ধার দেনা করে ও নিজের তহবিল থেকে অর্থব্যয় করে যে সময় তিনি কাশীর পাণ্ডাহাবেলী ও পঞ্চ-কোশীতে অন্নপূর্ণা পরিতৃপ্ত, কালী, তারা, বিশালাক্ষী, জয়ভবানী, গোপাল, দুর্গা ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন···। এ ছাড়া কুরুক্ষেত্র কুণ্ড ও দুর্গাকুণ্ড নামক দুটি জলাশয়েরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এ সবের ব্যয় নির্বাহের জন্য সেখানে তিনি প্রায় দেড় লাখ টাকার একটি তহবিল গঠন করেছিলেন।" *Collector of Benaras to Board of Revenue*, 23 October 1814—দ্র. বিমলপ্রসাদ রায়, রাণী ভবানীর দান, শারদীয়া বাঙলা দেশ, ১৩৯২।

৩. পিল্লা—অনুচ্চ স্তম্ভ :

নবম পরিচ্ছেদ

রাজকুমারী তারা

রাণী ভবানী যাঁহাদের সহায়তায় রাজসাহীর রাজ্য শাসন করিয়া প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রী বলিয়া ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রাজান্তঃপুরে রাজকুমারী তারা, এবং রাজকার্যালয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম, রাণী ভবানীর প্রত্যেক রাজকার্যের মন্ত্রণার সহায় বলিয়া পরিচিত ছিলেন ' স্বচক্ষে দর্শন করিতে না পারিলেও, স্বকর্ণে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, এই দুই-জন বিশ্বস্ত মন্ত্রীর সহায়তায়, রাণী ভবানী রাজকার্য সুসম্পন্ন করিতেন।

তারা ঠাকুরাণীর* নাম নানা কারণে বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন করিয়া বালবৈধব্য-পীড়িতা হইয়া নিরন্তর মাতৃসন্নিধানে বাস করিয়া বহুলপরিমাণে মাতৃ-গুণে বিভূষিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। যৌবনোন্মেষে তাঁহার রূপলাবণ্য সুশিক্ষার আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ভবানী তাঁহাকেই রাজসাহী-রাজ্যের পাটেশ্বরী করিবার আশায় নবাব-সরকারে জামাতার নামজারি করাইয়াছিলেন।[১]** তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে

* রাজসাহী প্রদেশে রাজকুমারীমাত্রই "ঠাকুরঝি মহাশয়"-নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন; ইঁহারা এখনও রাজকার্যে অনেক সহায়তা করিয়া থাকেন। প্রাদেশিক প্রথানুসারে তারা দেবীকে লোকে "তারা ঠাকুরঝি মহাশয়" বলিত; তিনি এখনও সেই নামে পরিচিতা।

** রাজসাহীর খাজুরা-গ্রাম-নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারা ঠাকুরঝি মহাশয়ের বিবাহ হয়; রাণী ভবানী কন্যাজামাতার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবেন বলিয়া নবাব দরবারে রঘুনাথের নামজারি করাইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেবের রাজস্ববিষয়ক পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে। রঘুনাথের মাতা রাজসাহী কালেক্টরী হইতে ইংরাজ রাজত্বেও পেনসন পাইয়াছিলেন।

আশা সফল হয় নাই; কিন্তু বালবিধবা তারা রাজসাহীর শাসনকার্যে লিপ্ত হইয়া রাণী ভবানীর সবিশেষ সহায়তা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তারা ঠাকুরাণীর বিষয় বিভবের অভাব ছিল না; মাতার স্নেহানুরাগে তিনি যে সকল তালুক উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে একালের লোকে বড়মানুষ বলিয়া অহংকার করিতে পারিতেন। কিন্তু রাজকুমারী তারা অতুলসম্পদের অধিকারিণী রাণী ভবানীর সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, আত্ম-সম্পদের অধিকাংশ ভাগ পুণ্যকীর্তিপ্রতিষ্ঠার্থই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। উপর্যুপরি প্রবল ভূমিকম্পে নাটোর রাজবাটীর প্রায় সমস্ত পুরাতন অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে; সমুন্নত মন্দির চূড়ায় যে সকল স্থান গৌরবময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখন ভগ্নস্তূপ! যে দুই চারিটি পুরাতন মন্দির বর্তমান ছিল, তাহা বিগত ১৮৯৭ সালের ১২ই জুনের ভূমিকম্পে একেবারে ধূলিপরিণত হইয়াছে। এখন কেবল একটিমাত্র মন্দির নাটোর-রাজবাটীর পূর্বগৌরবের সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান;—তাহার নাম তারকেশ্বর মন্দির। ইহা তারা ঠাকুরাণীর কীর্তিচিহ্ন।

নাটোরের ন্যায় বড়নগরেও তারা ঠাকুরাণীর কীর্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মাতার সহিত বড়নগরে গঙ্গাবাস করিবার সময়ে, তথায় একটি গোপাল-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহাতে তারা ঠাকুরাণী আত্মপরিচয় প্রদান করিবার সময়ে আপনার স্বামিকুলের উল্লেখ না করিয়া কেবল পুণ্যময়ী মাতার নামোল্লেখ করিয়া লিখাইয়াছিলেন;—

"খশূন্যমৈত্রশাকে শ্রীভবানীতনুসম্ভবা।
নির্মমে শ্রীমতী তারা শ্রীমদ্গোপালমন্দিরম্॥"

এতদ্ভিন্ন রাঢ়দেশে "তারা-পীঠ" নামে যে বিখ্যাত হিন্দুতীর্থক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও তারা ঠাকুরাণীর পুণ্যকীর্তির সাক্ষিরূপে অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। তিনিও মাতার ন্যায় পূজাব্যপদেশে ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিবার জন্য, এই সকল দেবোদ্দেশে অনেক দেবোত্তরভূমি দান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার অভাবে এই সকল

পুণ্যকীর্তি রক্ষা করিবার আশায়, সমস্ত ভার নাটোর ছোটতরফ রাজ-পরিবারের আদিপুরুষ রাজকুমার শিবনাথ রায় বাহাদুরের উপর ন্যস্ত করিয়া দানপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন।*

নাটোর রাজবংশের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে দয়ারামের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কখনও অসিহস্তে ভূষণার শিবিরে, কখনও লেখনী-হস্তে নাটোর রাজ-কার্যালয়ে, কখনও বা উষ্ণীষমস্তকে নবাব-দরবারে, দয়ারাম রায় আন্তরিক অনুরাগে নাটোরাধিপতির সৌভাগ্যবর্ধনের চেষ্টা করিতেন। রামজীবনের সংসারে দয়ারামের পদমর্যাদা সর্বজনপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি রাজবাটীতে "দয়ারাম দাদা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রাণী ভবানী যখন রাজসাহী-রাজ্যের শাসনভার পরিচালিত করিতেছিলেন, দয়ারাম তখন বার্ধক্যবশতঃ সর্বদা রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিসময়ে কেহ কেহ তাঁহার কৃত কার্যের দোষোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টায় তারা ঠাকুরাণীর নিকট অনেকরূপ অভিযোগ করিতেন। তদুপলক্ষে সময়ে সময়ে দয়ারাম ও তারা ঠাকুরাণীর মধ্যে কলহ হইত। সে কলহ কিরূপ সুখের কলহ ছিল, তাহার একটি জনশ্রুতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

একবার তারা ঠাকুরাণী সংবাদ পাইলেন যে, দয়ারাম কেবল-মাত্র আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। রাজভৃত্যের পক্ষে এরূপ কার্য সম্পূর্ণ অনধিকারচেষ্টা বলিয়া, তারা ঠাকুরাণীর পরামর্শে সেই সমস্ত ব্রহ্মোত্তর অসিদ্ধ গণ্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণকে রাজধানীতে আহ্বান করা হইল। বিপ্রবর্গ দয়ারামের শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে রাজদরবারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে

* রাজসাহীর কালেক্টারীতে তারা ঠাকুরাণীর দানপত্রের যে সকল অনুলিপি দেখিতে পাওয়া যায়, মূল দানপত্র নহে বলিয়া তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর নাই। অনুলিপিগুলিও এখন নিতান্ত জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই দানপত্র বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত।

বলিয়া, স্বয়ং রাণী ভবানীর দরবারে উপনীত হইলেন।

তারা ঠাকুরাণী বুঝাইয়া দিলেন যে, দয়ারাম রাজভৃত্যমাত্র, রাজকার্য-পরিচালনের অধিকার থাকিলেও, ভূমিদানের অধিকার নাই। অতএব তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত দানপত্রগুলি অসিদ্ধ! দয়ারাম ইহার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া এক খণ্ড পুরাতন জীর্ণ পত্র বাহির করিয়া রাণী ভবানীকে প্রদান করিলেন, এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন;—"মা! আমি রাজভৃত্য হইয়াও যে ব্রাহ্মণগণকে ভূমিদান করিয়াছি, তাহা অসিদ্ধ হয় হউক, তাহাতে আর দুঃখ কি? কিন্তু এই জীর্ণ পত্রখানি দেখুন, ইহা আপনার বিবাহের লগ্নপত্র; ইহাও কিন্তু এই রাজভৃত্য দয়ারামই স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিল।"* বলা বাহুল্য, কাহারও ব্রহ্মোত্তর আর অসিদ্ধ হইতে পারিল না।

তারা ঠাকুরাণীর শিক্ষা-দীক্ষার কথা, অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা এবং সর্বতোমুখী প্রতিভার কথা বঙ্গদেশের সকল স্থানেই ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কথা কালক্রমে সিরাজদ্দৌলারও কর্ণগোচর হইয়াছিল। মাতামহের অসঙ্গত বাৎসল্যবশতঃ সিরাজের বাল্যজীবনেই অশেষ কুশিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল; যৌবনোদগমে তাঁহার অধীর হৃদয় প্রবৃত্তিদমনে অশক্ত হইয়া নানারূপ ভোগবিলাসের সূচনা করিয়াছিল। হীরাঝিলের প্রমোদভবনে যে বিলাসলালসা বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তারা ঠাকুরাণীর দিকে ধাবিত হইল। বড়নগরনিবাসিনী রাণী ভবানী ও রাজকুমারী তারা তচ্ছ্রবণে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গোপনে বড়নগর হইতে পলায়ন করিয়া তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যুসংবাদ রটনা করার পরামর্শ স্থির হইলে, তদনুরূপ আয়োজন হইতে লাগিল। বড়নগরের নিকট যে সকল সন্ন্যাসী বাস

* "মাতর্দয়াময়ি তব দয়য়ৈব সদাশয়ঃ। মৎকৃতেন চ পত্রেণ বিবাহো যদি সিধ্যতি। ভৃত্যোঽয়ংহি দয়ারামো দত্তভূমিং দ্বিজন্মনে। তুচ্ছং ব্রহ্মোত্তরপত্রং সিধ্যেদিত্যত্র কা কথা।"

—লঘুভারতম্।

করিতেন, তাঁহারাই রাণী ভবানী ও তারা ঠাকুরাণীকে গোপনে নাটোরে আনয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এই জনশ্রুতি একেবারে অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। রাণী ভবানী সন্ন্যাসী-দিগের এই কার্যের প্রত্যুপকার করিবার জন্য নাটোরে একটি আখড়া স্থাপন করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন ; তাহা অদ্যাপি বর্তমান আছে।

জনশ্রুতির কল্যাণে এই ঘটনা বহুবিধ আকারে বঙ্গসাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে। দ্বাদশনারী রচয়িতা[২] বলেন,—

"রাজকন্যা তারার রূপরাশির প্রশংসাবাদ শুনিয়া তারাকে আপন জীবনতোষিণী করিতে দুরন্তের ইচ্ছা হইল। ভবানী অর্থের প্রলোভনে ভুলিলেন না। বরং গর্বসহকারে সিরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদিও হিন্দুগর্ব খর্বপ্রায়—যদিও হিন্দু আজি উৎসন্নদশাগ্রস্ত, তথাপি সিরাজ হেন পাপিষ্ঠেরা তাহার পদদলিত হইবার যোগ্য নহে। সৈন্যদল নবাবের আজ্ঞাক্রমে রাজসাহীর রাজভবনলুণ্ঠনমানসে তদভিমুখে গমন করিল। অন্নদাত্রী পালনকর্ত্রী মাতার উত্তেজনায় সমগ্র রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। ভবানীর শত সহস্র প্রজা সৈন্য সিরাজের বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিল।"

দ্বাদশনারী-লেখক এইরূপ উপক্রমণিকা করিয়া, এই যুদ্ধ বর্ণনায় ইহার উপসংহার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, সে যুদ্ধে সিরাজসেনা পরাজিত হইয়া মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিয়াছিল। রাজসাহী প্রদেশে কিন্তু এরূপ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায় না। নবাব আলিবর্দীর শাসন-সময়ে সিরাজের যৌবনোদগমকালে তারার উপর তাঁহার পাপচক্ষু পতিত হইয়াছিল ; তাহা লইয়া কোনরূপ প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের আয়োজন হইতে পারে নাই। সিরাজের হৃদয়বেগ দুর্দমনীয় ; সুতরাং রাণী ভবানী বড়নগর হইতে নাটোরে পলায়ন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন —ইহাই রাজসাহীর জনশ্রুতি।

আর একজন লেখক বলেন :—

"রাজকুমারী তারার অলৌকিক রূপলাবণ্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলা গঙ্গাবাসপুরীতে (বড়নগরে) আগমন

করিয়া সসৈন্যে রাজপুরী বেষ্টন করিলেন। মাতা ও কন্যা আত্মঘাতিনী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রাজরাজেশ্বরীর মন্দিরে পূজা আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে মস্তরাম নামক জনৈক সন্ন্যাসী শূলহস্তে সিরাজের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রাণভয়ে পলায়ন করায় রাজকুমারীর ধর্মরক্ষা হইল।"*

বড়নগর রাজবাটীর রাণী ভবানীর বংশধর রাজা উমেশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছেন বলিয়া আর একজন লেখক লিখিয়া গিয়াছেন :—

"প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী এই সময়ে বঙ্গের প্রধান জমিদার ছিলেন। ইঁহার হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ইঁহার প্রচুর ধনবল ও সৈন্যবল ছিল। প্রজাদিগকে প্রাণদণ্ডাদি সর্ববিধ দণ্ডদানের অধিকার ছিল। রাণী এই সময়ে আজিমগঞ্জের নিকটস্থ তাঁহার প্রকাণ্ড ভবনে বিধবা দুহিতা তারা দেবীর সহিত গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। তারা অপূর্ব সুন্দরী, তৎকালীন বঙ্গীয় রূপসীমণ্ডলে আদর্শ রূপবতী ছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে তারার বিবাহ হয়। বিবাহের সাত দিবস পরে তিনি বিধবা হন। এখন তারা পূর্ণযৌবনা, এক দিন প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া সিক্ত-কেশের রাশি শুষ্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে নবাবের বজরা সেই ভবনের নিম্নস্থ জাহ্নবীবক্ষে ধীরগতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। তরলমতি নবাব শ্যেন পক্ষীর মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার তরুণ প্রাণে তারার রূপের যে ছাপ বসিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। অবশেষে উন্মাদের মত রাণীর নিকট তারাপ্রাপ্তির প্রস্তাব করিলেন। রাণী রোষে ঘৃণায় অপমানে সংক্ষুব্ধ হইয়া সেই পাপ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদান করিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা-কৌশলে পরাজিত হইয়া বল অবলম্বন করিলেন। ভবানী ভয় পাইলেন না, তাঁহার সাহস টুটিল না।" ইত্যাদি।†

* লঘুভারতম্।

† নব্যভারত; ১২৯৮;—শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়

বড়নগরের রাজা উমেশচন্দ্র এখন স্বর্গারূঢ়। তিনি রাণী ভবানীর বংশধর বলিয়া গৌরব করিতেন, এবং অনেক বিষয়ে বর্তমান লেখকের সহায়তা করিতেন। তাঁহার নিকট শুনা বলিয়া যত কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই যে তিনি বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া গেল। কোনরূপ প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের আয়োজন বা যুদ্ধকলহের কথা যে রাজা উমেশচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন, তাহা বোধ হয় না। রাণী ভবানীর জীবনী সঙ্কলনের জন্য তাঁহার নিকট যে প্রশ্নাবলী প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহার উল্লেখ ছিল ; কিন্তু রাজসাহী প্রদেশের প্রচলিত জনশ্রুতির কোন প্রতিবাদ করেন নাই।

জনশ্রুতি মুখে মুখে বিস্তৃত হইয়া এত রূপান্তরিত হইয়া পড়ে যে, অল্পদিনের মধ্যেই সত্যের সঙ্গে অসত্য জড়িত হইয়া প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দেয় ; এই স্থলেও তাহাই হইয়াছে। মুসলমানদিগের ইতিহাসে সিরাজের অনেক কুকীর্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু এই ঘটনার উল্লেখ নাই। প্রকাশ্য যুদ্ধ হইলে তাহার কোন-না কোনরূপ উল্লেখ থাকা সম্ভব হইত।

সিরাজের নবাবী আমলে এই ঘটনা সংঘটিত হয় নাই ; আলিবর্দীর শাসন সময়ে হইয়াছিল। সিরাজ ইচ্ছামাত্রই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কোন-রূপ বাহুবলপ্রয়োগের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার চরিত্রবিকারের কথা কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। রাণী ভবানী কলঙ্কগ্রস্ত হইবার ভয়ে তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যু রটনা করিয়া দিয়া নাটোরে পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহাই বিশ্বাসযোগ্য জনশ্রুতি।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রানী ভবানীর জামাতা রঘুনাথ। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রহীনা নারী একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরীর বিবাহ দেন স্থানীয় যুবক জমিদার রঘুনাথ লাহিড়ির সঙ্গে। রানী-মাতার ইচ্ছা ছিল রঘুনাথের হাতে জমিদারীর ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি অবসর জীবন-যাপন করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু দিনের মধ্যেই রঘুনাথ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (১৭৫১ খৃঃ)

২. দ্বাদশ নারী রচয়িতা—দুর্গাদাস লাহিড়ি। দুর্গাদাস লাহিড়ি এবং লঘু-ভারতম্-এর লেখক উভয়েই জনশ্রুতিমূলক উপন্যাস বর্ণনা করিয়াছেন—ইহার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই, কারণ এই জনশ্রুতি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ তথ্য দ্বারা সমর্থিত নয়। এই প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৫৪৮, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

দশম পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রবিপ্লব

রাণী ভবানী যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে জমিদারেরাই প্রকৃত প্রস্তাবে এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের ন্যায় প্রবলপ্রতাপশালী মোগল রাজরাজেশ্বরকেও জমিদারবর্গের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইয়াছিল।[১]*

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনসময়ে[২] রাজস্বদানে অশক্ত হইয়া কোনও কোনও পুরাতন জমিদারকে রাজপদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; তদুপলক্ষে যে '.কল নূতন জমিদারের অভ্যুদয় হয়, তাঁহারাও অল্পদিনের মধ্যেই প্রাচীন জমিদারবংশের ন্যায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমির প্রাচীন জমিদার-বংশ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজবংশ, বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া মোগল রাজসরকারে নির্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিয়া স্বরাজ্যে স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার রাজশক্তির পরিচালন করিতেছিলেন। ইঁহারা দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদন করিয়া অপরাধিগণকে

---

* The first class of Bengal Zamindars represented the old Hindu and Mohomedan Rajas of the country, previous to the Mogul conquest by the Emperor Akbar in 1576, or persons who claimed that status. The second class were Rajas, or great landholders, most of whom dated from the 17th and 18th centuries, and some of whom were, like the first class, *de facto* rulers in their own estates or territories, subject to a tribute or land tax to the representative of the Emperor. These two classes had a social position faintly resembling the Feudatory Chiefs of the British Indian Empire, but that position was enjoyed by them on the basis of custom, not of treaties,

—*The Bengal MS. Records*, Vol I, 31.

রাজবাটীতে কারারুদ্ধ করিতেন, সেনাপালন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেন, এবং সর্বাংশে সামন্ত নরপতির ন্যায় পদগৌরব সম্ভোগ করিতেন।*

বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব নাজিমের ন্যায় এই সকল জমিদার-গণও দিল্লীশ্বরের সনন্দ গ্রহণ করিয়া, দিল্লীশ্বরের নামের দোহাই দিয়া, রাজকার্য নির্বাহ করিতেন; সুতরাং যথাকালে রাজকর প্রদান করিতে পারিলে, মুর্শিদাবাদের নবাব ইঁহাদিগের রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।

নবাব আলিবর্দী খাঁ এই সকল পরাক্রান্ত জমিদার দলের সহায়তায় দিল্লীশ্বরের নিকট সনন্দলাভ করিয়া বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মস্‌নদ অধিকার করেন[৩]। বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত হইয়া কখনও ঋণগ্রহণে, কখনও বা সেনা-সহায়তাগ্রহণে, নবাব আলিবর্দী জমিদারদলের পদম..দার উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। জমিদারেরা স্বরাজ্যে এত দূর প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ইংরাজ সওদাগরগণ তাঁহাদের দরবারেই বিচারপ্রার্থী হইতেন; সময়ে সময়ে তাঁহাদের উৎপীড়নে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া হাহাকার করিতেন; কখনও বা উৎকোচ উপঢৌকন পাঠাইয়া মনস্তুষ্টিসাধন করিতেও ক্রটি করিতেন না।

সিরাজদ্দৌলা ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের ন্যায় স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিবার আশায়, নাম-সর্বস্ব দিল্লীর বাদশাহের সনন্দ-গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করিলেন না। বাহু-বলে ইংরাজদমন করিয়া, শাসনকৌশলে জমিদারগণকে পদানত রাখিয়া, বিচারবলে দুষ্টদলন করিয়া, ইচ্ছানুসারে রাজ্যশাসন করিবেন, অঙ্কুরেই তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সিরাজ-চরিত্র অদম্য হৃদয়-বেগের বশীভূত হইয়া উত্তরোত্তর অনেকের স্বার্থের পথে কণ্টক রোপণ

* Such Zamindars held princely courts, maintained their own bodies of armed followers, dispensed justice in their territories or estates, and handed down their position from father to son.— *The Bengal MS. Records*, Vol. I., 33.

করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্বেই, রাজধানীর পাত্রমিত্রগণ, জমিদারদলের সহায়তায় অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন ; রুগ্নশয্যাশায়ী বৃদ্ধ আলিবর্দীও তাহার পূর্ব লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া অন্তিম সময়ে সিরাজদ্দৌলাকে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের চেষ্টায় নওয়াজেস মোহম্মদকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল।[৪] আলিবর্দীর জীবনকালে নওয়াজেসের মৃত্যু হওয়ায় সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র ষড়যন্ত্রকারিগণ স্বার্থরক্ষার জন্য নওয়াজেসের পালিত পুত্রের সদ্যোজাত শিশুসন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে মিলিয়া পূর্ণিয়ার নবাব সাইয়েদ আহম্মদের পুত্র শওকৎ জঙ্গকেই নবাব নির্বাচনের চেষ্টা করায়, সিরাজদ্দৌলা নবাবগঞ্জের যুদ্ধে শওকৎ জঙ্গকে নিহত করায়, সে আশাও নির্মূল হইয়া গেল। ষড়যন্ত্রকারিগণ তখন অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজদিগের সহায়তায় মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে দেখিতে পারিতেন না ; ইংরাজেরাও তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই ; এরূপ ক্ষেত্রে ইংরাজেরাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে অসম্মত হইলেন না।

রাণী ভবানী এই সকল ষড়যন্ত্রে কোন পক্ষেই লিপ্ত ছিলেন না ; তিনি বিদেশীয় বণিক-সমিতির সহায়তায় সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পক্ষপাতিনী ছিলেন না। বরং জমিদারদলের অগ্রণী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে এই অকীর্তিকর রাজবিদ্রোহের সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আশায়, ইঙ্গিতে সদুপদেশ প্রেরণ করিবার জন্য, শাঁখা, সিন্দুর ও শাড়ী উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রমণীর নিকটেও যাহা স্ত্রীজনসুলভ কাপুরুষোচিত অপকার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, বাঙ্গলার

প্রধান প্রধান পুরুষ জমিদার ও সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারিগণ তাহা পৌরুষের কার্য বলিয়া ইংরাজের সহায়তা গ্রহণ করাই স্থির করিলেন।[৫]

ষড়যন্ত্রের কথা আকারে-ইঙ্গিতে সিরাজ-কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করায় তিনি মীরজাফরকেই সেনাপতিপদে বরণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবারে পলাশির প্রান্তরে সিরাজ-সেনার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধাভিনয় হইল, তাহাতেই সিরাজদ্দৌলার সর্বনাশ হইয়া গেল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজপ্রাসাদে, এবং রাজপ্রাসাদ হইতে কাঙ্গালের মত রাজপথে দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন। সেনা সংগ্রহ করিয়া নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধারকামনায় গোপনে বিহার প্রদেশে পলায়ন করিতে গিয়া, পথিমধ্যে ধৃত ও শৃঙ্খলাবদ্ধচরণে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া, কুক্কুরের ন্যায় নির্দয়রূপে নিহত হইলেন!

পলাশির যুদ্ধাবসানে যে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হইল, তাহাই বাঙ্গলার জমিদার-বংশের স্বাধীন রাজশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিল। রাজ-বিদ্রোহী রাজকর্মচারী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ; পদাশ্রিত বণিক-সমিতি সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন ; তাঁহাদের সহিত নবাবের এবং নবাবের সহিত তাঁহাদের, নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হইতে লাগিল।

মীরজাফর ইতিহাসে "ক্লাইবের গর্দভ" নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।[৬] ক্লাইব স্বদেশযাত্রা করায়, যাঁহাদিগের উপর কলিকাতার ইংরাজদরবারের কার্যভার ন্যস্ত হইল, তাঁহারা মীরকাশিমের টাকা খাইয়া, জরাপলিত বৃদ্ধ "গর্দভকে" কলিকাতায় নির্বাসিত করিয়া, মীরকাশিমকে সিংহাসনদান করিলেন।

মীরকাশিমের দিনও সুখে কাটিল না।[৭] তিনি বাঙ্গালীর বাণিজ্য রক্ষা করিতে গিয়া, ইংরাজের বিরাগভাজন হইলেন। কালক্রমে তাহাতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে অগ্নিতে মোগলরাজছত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল। মীরকাশিম ফকিরের ন্যায় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা হইতে চিরবিদায়-

গ্রহণ করিলেন ; বৃদ্ধ মীরজাফর ইংরাজের হাত ধরিয়া আবার জরাপলিত-মস্তকে গৌরবহীন রাজমুকুট পরিধান করিলেন।[৮]

দিল্লীশ্বর শাহ আলম নামমাত্র বাদশাহ্ ছিলেন। মহারাষ্ট্র সেনাপতি-গণ তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তিনি কখন আহমদ শাহ আব্‌দালী, কখন বা অযোধ্যাধিপতি উজীর বাহাদুরের শরণাপন্ন হইয়া, সিংহাসনারোহণের আয়োজন করিতেছিলেন। তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে, বার্ষিক ২৬০০০০০ লক্ষ টাকা রাজকর লইয়া, ইংরাজদিগকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ প্রদান করিলেন।

ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে "শুভ পুণ্যাহের" সূচনা করিয়া বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তিমূল প্রোথিত করিলেন ; এই হইতে কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিল।

দিল্লীর অধঃপতনে মোগল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল ; মুর্শিদাবাদের অধঃপতনে, সর্বত্র অরাজকতার সূত্রপাত হইল। কোম্পানী বাহাদুর নূতন রাজ্যে সহসা শান্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেন না ;— অরাজকতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে রাণী ভবানী স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণ-পণে প্রজারক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনকৌশলে দস্যু-তস্করের অত্যাচার প্রবল হইতে পারিল না ; কিন্তু ইংরাজ বণিকদিগের অত্যাচার প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংরাজেরা বঙ্গদেশের নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; রাণী ভবানীর রাজ্যেই তাঁহাদের অধিকাংশ বাণিজ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত। লাভের লোভে অন্ধ হইয়া ইংরাজ সওদাগরগণ বলপূর্বক সুলভ মূল্যে ক্রয় ও দুর্লভ মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করায়, দেশের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। রাণী ভবানী ইহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না ; যাঁহারা দিল্লীশ্বরের সনন্দক্রমে বঙ্গদেশের রক্ষক, তাঁহারাই স্বার্থরক্ষার জন্য ভক্ষক হইয়া উঠিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রানী ভবানী স্বামী রাজা রামকান্তের মৃত্যুর (১৭৪৮ খৃঃ) পর নিজহস্তে জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় বাংলার নবাব আলিবর্দী খান। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী নবাবদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জমিদারদের বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা হইতে বিরত ছিলেন। কোন জমিদার যতক্ষণ পর্যন্ত নবাব কর্তৃক ধার্য রাজস্ব নবাব সরকারে জমা দিতেন ততক্ষণ তাঁহারা বহু বিষয়ে কার্যত স্বাধীন ছিলেন।

২. নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন সময় ১৭০৩-১৭০৭, ১৭১০-১৭২৭ খৃঃ।

৩. নবাব আলিবর্দী বাংলার মসনদ লাভ করেন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল।

ইউশুফ আলি খাঁর তারিক-ই মহাবৎ জঙ্গ-এর সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায় যে **"towards the end of April (1740) he received from the Emperor the recognition of his authority as the Subahdar of Bengal along with the rites of Shujaulmulk and Husanuddaulah (the Valorous of the State and the Sword of the Emperor)" Quoted by K. K. Datta, *Alivardi and His Times*, p. 32-33.**

৪. রাজবল্লভ বিক্রমপুরের এক বৈদ্য পরিবারের সন্তান। ঢাকার নবাব নওয়াজেস মহম্মদ এবং তাঁহার পত্নী ঘসেটি বেগম ইহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। পরে নিজের যোগ্যত্যবলে ইনি নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। সিরাজ ও রাজবল্লভের বিরোধের কারণের জন্য রমেশচন্দ্র মজুমদার রচিত বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃঃ ১৬০-১৬১, ১৬৮ দ্রষ্টব্য।

৫. "সাত আট জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাত্রিযোগে সম্মিলিত হইয়া অনেক বাদানুবাদের পর অবশেষে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, ইহা সর্বৈব মিথ্যা। রাণী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভের মুখে নবীনচন্দ্র (সেন) বড় বড় বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ ষড়যন্ত্রে একেবারেই লিপ্ত ছিলেন না।" রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃঃ ১৬৮।

৬. মীরজাফরের চরিত্র ও পরিণাম সম্পর্কে চন্দননগরের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জ্যঁা ল-র মন্তব্য প্রাসঙ্গিক : **Sunk in gross sensual pleasures and weakened by his addiction to opium and the hemp**

drug (*bhang*) he had not even the energy of Aliyardi, who was twenty years older in age. In his last years, in the ignominous repose of the throne of Bengal, as "Lord Clive's Jack-ass" he developed leprosy—a loathesome end to a loathsome life. Quoted in *History of Bengal*. Vol. II, Dacca University, p. 470.

৭. মীরকাশিমের নবাবীকাল ১৭৬০-১৭৬৩।

৮. মীরজাফরের রাজত্বকাল ১৭৫৭-১৭৬০ ; ১৭৬৩-১৭৬৫।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন নবাব

পলাশির যুদ্ধের পর হইতেই একদল নূতন নবাবের[১] আবির্ভাব হইয়াছিল ; ইঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী। কোম্পানী বাহাদুর যৎসামান্য বেতনে যে সকল ইংরাজ গোমস্তা এদেশে পাঠাইয়া দিতেন, তাঁহারা ধর্মপথে থাকিয়া কোম্পানীর কার্য নির্বাহ করিতে পারিতেন না। সামান্য বেতনে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ করাও কঠিন হইত ; তাহার পর যখন ভারতবর্ষের তৎকালপ্রচলিত বিলাসলালসা বর্ধিত হইত, অল্পবয়স্ক ইংরাজ যুবকগণের পক্ষে উপায়ান্তর অবলম্বন পূর্বক অল্পদিনে প্রভূত ধনোপার্জন করা আবশ্যক হইয়া উঠিত। তাঁহাদের ধনতৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য যে উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও, এখন ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকেন।

যথাসম্ভব অল্পমূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া তাহাই অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করা ও তদ্দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত ধনোপার্জন করা অনেকেরই লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপশালী নূতন নবাব হইয়া লক্ষ্যসাধনের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাঁহাদিগের কার্যে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারিত না ; তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইত না ; কেহ অভিযোগ উপস্থিত করিলেও কে তাহার বিচার করিবে ? দেশ অরাজক, মোগল গৌরবরবি অস্তগত, জমিদারদিগের শাসনক্ষমতা পতনোন্মুখ ; ইংরাজেরা রাজ্যের সকল স্থানে প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইবার, তাহাই হইতে লাগিল। দেশের লোকে হাহাকার করিতে লাগিল ; কত লোকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের[২] নামোল্লেখ করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিল ; তাহারা বলিতে লাগিল যে, তিনিই ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া দেশের সর্বনাশ করিলেন। এইরূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সর্বত্র "নিমক-

হারাম” নামে কলঙ্কিত হইতে লাগিলেন।*

কৃষ্ণচন্দ্রের অপরাধ কি, লোকে তাহা ধীরভাবে বিচার করিবার অবসর পাইল না। ইংরাজ নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া সকলেই নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। যাঁহারা সেদিনও মুসলমানের অনুগ্রহভিক্ষার জন্য নবাবদরবারে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইতেন, এবং নবাবের শুভদৃষ্টিলাভের আশায় হিন্দু মুসলমান আমীর ওমরাহগণকে নানারূপ স্তুতি স্তবন করিতেন, তাঁহারা যে রাষ্ট্রবিপ্লবে কতদূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন ও সেই ক্ষমতাবলে দেশের লোকের উপর কিরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ বোধ হয়। সরকারী কাগজপত্রে এখনও যে দুই চারিটি অত্যাচারকাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট।

বিনোদরাম চট্টোপাধ্যায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণসন্তান। তিনি বার্টন নামক একজন সাহেবের কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হন। সাহেব কলিকাতার ইংরাজদরবারের দ্বারদেশে বিনোদরামকে অবরুদ্ধ করিয়া ভৃত্যবর্গের সহায়তায় হস্তপদ বন্ধন করিয়া বংশখণ্ডে বিলম্বিত অবস্থায় চট্টোপাধ্যায়কে স্বগৃহে বহন করিয়া আনিলেন। তথায় স্বহস্তে নিতান্ত নির্দয়রূপে চাবুক প্রহারে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া মুখের মধ্যে বলপূর্বক গোমাংস প্রবিষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।** বিনোদরামের এইরূপ

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত—কার্তিকেয়চন্দ্র রায়

** Mr. Barton laying in wait seized Binautram Chattagee opposite to the door of Council, and with the assistance of his bearers, and two peons tied his hands and feet, swung him upon a bamboo like a hog, carried him to his own house; there with his own hands chawbooked him in the most cruel manner, almost to the deprivation of life; endeavoured to force beef into his mouth, to the irreparable loss of his Brahmin's caste, and all this without giving ear to, or suffering the man to speak in his own defence, or clear up his innocence to him.

বিচারপ্রণালীতে দেশের লোক যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহা এখন কল্পনা করাও অসম্ভব। যাহারা অল্পবুদ্ধি নিরক্ষর, তাহারা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশংসা করিতে পারিল না; যাঁহারা পদস্থ ধনশালী ইংরাজবন্ধু, তাঁহারাও এরূপ কার্যের অন্য কোন সদুত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না। উত্তরকালে কবিকাহিনীতে লিখিত হইয়াছে,—

"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"✝

লোকে এই হিতকথায় সান্ত্বনালাভ করিতে পারিল না; তাহারা মনে মনে নূতন নবাবদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই অসন্তোষ কালে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অরাজকতার মূলোচ্ছেদ করিয়া, সুশিক্ষার বহুল প্রচার করিয়া, সুবিচার ও সুশাসনের বহুবিধ বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া, ইংরাজরাজ সভ্যসমাজে আদর্শ শাসনকর্তা বলিয়া কীর্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ইংরাজ শাসন প্রচলিত হয় নাই, কেবল ইংরাজবাহু দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

রাণী ভবানী রাষ্ট্রবিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। তথাপি তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করেন নাই। এখন সকলেই তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে যে অভিনব উপদ্রবের সৃষ্টি হইল, তাহা এ দেশের লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন।

বঙ্গদেশে বহুবার রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে; কখনও হিন্দু, কখনও বৌদ্ধ, কখনও পাঠান, কখনও মোগল বাঙ্গালীর উপর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল রাষ্ট্রবিপ্লবে দীনদুঃখীদিগের দুঃখ ছিল না; যাঁহারা রাজা বা জমিদার, তাঁহাদেরই সর্বনাশ হইত; দেশের লোকে নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে সক্ষম হইত; যিনি রাজসিংহাসন

Selections from the Records of the Government of India, Vol. I., Record no. 463.

✝ পলাশীর যুদ্ধ কাব্য।

অধিকার করিতেন, তাঁহাকেই সহাস্যবদনে করপ্রদান করিত। বর্তমান রাষ্ট্রবিপ্লবে ইহার বিপরীত ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল। দেশের রাজা ও জমিদারবর্গ ইংরাজের সহায়; তাঁহাদের আপাততঃ কোনও ক্ষতি হইল না; যাহারা নিতান্ত দীন দুঃখী অসহায়, তাহাদিগেরই সর্বনাশ হইতে লাগিল। হাট-বাজার কাঁপিয়া উঠিল; ইংরাজের গোমস্তার অত্যাচারে জোলা তাঁতি পলায়ন করিতে লাগিল; অর্থোপার্জনের আশায় ইংরাজেরা ধান চাউল পান সুপারি তামাক লবণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার দ্রব্যের কারবার খুলিয়া দিলেন; অন্তর্বাণিজ্যে দরিদ্র বঙ্গবাসীর যে দুই পয়সা আয় হইবে, সে আশা ত ফুরাইল।

নূতন নবাবদিগের দৌরাত্ম্যে যে কেবল বাঙ্গালীরই সর্বনাশের সূত্রপাত হইল, তাহা নহে;—কোম্পানী বাহাদুরেরও বিলক্ষণ সর্বনাশ হইতে লাগিল! ইংরাজ কর্মচারিগণ স্বার্থসাধনের জন্য কোম্পানীর বাণিজ্যোন্নতির বিষয়ে উদাসীন হইয়া আপন আপন বাণিজ্যোন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। সহসা যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত হইয়া সামরিক ব্যয় বর্ধিত হইতেছিল, তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাতের কোর্ট অব্ ডিরেক্টারের সদস্যগণ পুনঃপুনঃ পত্র লিখিয়াও ইহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না!

বঙ্গদেশের ইংরাজ কর্মচারিগণ নানা স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া ও বহু-সংখ্যক সেনা নিয়োগ করিয়া আত্মপক্ষ প্রবল করিতে লাগিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টারের সদস্যগণ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"তোমাদের প্রভু বণিক, সে কথা ভুলিয়া গিয়া তোমরা সামরিক চিন্তায় আত্মহারা হইয়াছ কেন? আমাদের মূলধনের অর্ধাংশ কি দুর্গপ্রাচীরতলে প্রোথিত করিব?"*

* We cannot avoid remarking that you seem so thoroughly possessed with miliary ideas as to forget your employers are merchants, and trade their principal object; and we were to adopt your severel plans for fortifying, half our capital would be buried in stone walls.—*Courts' letter, 23 March, 1759 para 55.*

এরূপ তীব্র তিরস্কারেও ফল হইল না। এ দেশের ইংরাজেরা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "তাহা না করিলে ইংরাজ বাণিজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে :— ফরাসি বা ওলন্দাজগণ ভারতবাণিজ্যে একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন।" সুতরাং এ দেশের ইংরাজদিগের ইচ্ছামতই সকল কার্য চলিতে লাগিল।

রাণী ভবানীর জীবনকাহিনীর সহিত এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার ঘনিষ্ঠ সংস্রব। তিনি তৎকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানের অধিশ্বরী; কেবল তাহাই নহে; তাঁহার রাজ্যমধ্যেই ইংরাজদিগের অধিকাংশ বাণিজ্যালয়। তখনও রাণী ভবানীর স্বাধীন শাসনক্ষমতা তিরোহিত হয় নাই, তখনও স্বরাজ্যের জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা তাঁহার করতলগত। সুতরাং নূতন নবাবদিগের সহিত রাণী ভবানীর নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হইতে লাগিল।

এ দেশের রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে যে ইংরাজ লেখকগণ শতমুখে রাণী ভবানীর শাসনপ্রতিভার প্রশংসা কীর্তন করিতেন, রাজ-কার্যে হস্তক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারাই রাণী ভবানীর শাসনকলঙ্ক আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণী ভবানী রমণী,—অবরোধ-কারাবাসিনী বিধবা হিন্দুরমণী; অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাচ্ছন্না, পাত্রমিত্রপরিবেষ্টিতা, শাসনকৌশলবিহীনা, অযোগ্য ভূম্যধিকারিণী, ইত্যাদি অনেক কথা ইংরাজদরবারে উপনীত হইতে লাগিল। ভবানী সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজকার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এবং দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, আর্তের রক্ষণ, আশ্রিতের কল্যাণসাধন করিয়া আপন পদগৌরবের মর্যাদা রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. নূতন নবাব বলিতে গ্রন্থকার কোম্পানীর সেইসব কর্মচারীদের বুঝাইতেছেন যাহারা অসদুপায়ে 'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থ সংগ্রহ করিয়া এদেশে এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া নবাবী চালে চলিতেন। ইঁহাদের সম্পর্কে এডমাণ্ড বার্কের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক : **The office given to a young man going to India is of trifling consequence. But he that goes out an insignificant boy, in a**

few years returns a great Nabob. Mr. Hastings says he has two hundred and fifty of that kind of raw material, who, expect to be speedily manufactured into the merchant like qualty I mention". *Burke, Speech on Fox's E I Bill in Works and Corr., Ed.* 1832, iii, 506.

২, নদীয়া অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০—১৭৮২) । "The English were able to raise a volunteer army, and a certain amount of subscriptions, from the native, the Armenian, and the Portuguese inhabitants of Calcutta, to defend that city aganist the threatened encroachment of the Marathas. This shows that the people reposed some amount of confidence in the support of the English. So, when after a few years, Mir Jafar and some of the influential Zamindars of Bengal assembled in the house of Jagat Seth at Murshidabad to devise plans for the overthrow of Seraj-ud-daula, the wisest of them, Maharaja Krsnachandra of Nadia, suggested the advisability of inviting the help of the English against the Nawab, because of their efficient administiation of justice and steady protection of those who sought their help. Rajiblochan's *Krishnachndra carita*, pp. 64 73, Quoted in K. K. Datta, *Alivardi and his Times*, p. 94.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দেশের কথা

প্রসঙ্গক্রমে অনেক যুদ্ধ কলহ ও রাষ্ট্রবিবর্তনের কথা শুনাইতে বসিয়া, দেশের কথা বর্ণনা করা হয় নাই। রাণী ভবানী যে রাজ্যের মহারাণী ও প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী বলিয়া পূজনীয়া হইয়াছিলেন, সে রাজ্যে শিক্ষা দীক্ষা শিল্প বাণিজ্য সকল বিষয়ের সঙ্গেই তাঁহার সংস্রব ছিল। তাহার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

রাণী ভবানীর সময়ে দুই শ্রেণীর রাজকর প্রচলিত ছিল;—আসল[১] ও আবওয়াব[২]। আসল জমা যৎসামান্য ছিল, আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ অনির্দিষ্ট থাকায়, তাহাই অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহারা কৃষিজীবী, তাহারা যৎসামান্য রাজকর প্রদান করিত;—যাহারা ব্যবসায়ী, তাহাদিগকেই অধিকমাত্রায় রাজকর প্রদান করিতে হইত।

সেকালে বাস্তুভূমির রাজকর বড়ই যৎসামান্য ছিল; নিতান্ত দরিদ্র লোকেও ঘর-বাড়ি বাঁধিয়া নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিত। রাণী ভবানীর রাজ্যে অধিকাংশ বাস্তুভূমি নানা কারণে রাজকরপ্রদানের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করায়, প্রজাপুঞ্জের পক্ষে নিরুদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অধিকাংশ বাস্তু-ভূমিই কার্যতঃ নিষ্কর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; রাণী ভবানীর রাজ্যে উত্তরদ্বারী গৃহের জন্য রাজকর গৃহীত হইত না বলিয়া, তদুপলক্ষেও অনেকে অব্যাহতিলাভ করিয়াছিল।

আসল জমার পরিমাণ যতই যৎসামান্য হউক, আবওয়াবের পরিমাণ নিতান্ত যৎসামান্য ছিল না[৩]। সেকালের শিল্প বাণিজ্যাদির লভ্যাংশের উপর আবওয়াব ধার্য হইত, সামাজিক ও পারিবারিক মাঙ্গলিক ব্যাপারের জন্যও আবওয়াব প্রদান করিতে হইত। এতভিন্ন বিচারকার্যের জন্য অর্থী প্রত্যর্থিগণকে নানারূপে অর্থব্যয় করিতে হইত। এই সকল উপায়ে রাণী ভবানীর প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি সেই অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার

করিতেন, তাহার নিদর্শনে, বঙ্গভূমি কেন,—ভারতবর্ষের বিবিধ পুণ্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

এই সকল কারণে রাণী ভবানীর রাজ্যে লোকের সুখের অবধি ছিল না। তাহারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিত। ইংরাজেরা রাজসাহী রাজ্যের এইরূপ উন্নত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াই নানা স্থানে বাণিজ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ আজকাল কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্য তিরোহিত হইয়া কেবলমাত্র কৃষিকার্যই অবশিষ্ট রহিয়াছে। রাণী ভবানীর সময়ে এ দেশের এরূপ দুর্দশা ছিল না। কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের জন্য রাজসাহীর সবিশেষ সুখ্যাতি ছিল; কার্পাসবৃক্ষের কৃষিকার্যে, কার্পাসসূত্রের ক্রয়-বিক্রয় ও কার্পাসবস্ত্রের বিনিময়ে, বাঙ্গালীরা সুসভ্য ইউরোপ হইতেও অর্থোপার্জন করিতেন।

ইংরাজেরা বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে জমিদারী লাভ করার পর[৪] হইতেই, তাঁহাদের অসঙ্গত অত্যাচারে ও অশিষ্ট আচরণে, বাঙ্গালীর শিল্প-বাণিজ্য উৎসন্ন হইবার সূত্রপাত হয়। ইংরাজ বণিক বামনের ন্যায় বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে ত্রিপাদ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া, কালক্রমে বাঙ্গালীর শিল্প ও বাণিজ্য ও কারুকার্যের স্বর্গ মর্ত্য রসাতল অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর রাজ্যে এই উপলক্ষে কিরূপ অত্যাচার হইত, মালদহের ইংরাজ রাজকর্মচারী গ্রে সাহেব তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।*

কলিকাতার ইংরাজ দরবারের সহৃদয় সদস্যগণ, বা বিলাতের কোর্ট

*** Mr. Gray, Resident at Malda, in January 1764 wrote to the President,—"Since my arrival here, I have had an opportunity of seeing the villainous practices used by the Calcutta gomastas, in carrying on their business. The Government has certainly too much reason to complain of their want of**

অব্ ডিরেক্টারের কর্তৃপক্ষীয়গণ সহসা এই অশিষ্ট ব্যবহারের গতিরোধ করিতে না পারায়, বাঙ্গালার শিল্প-বাণিজ্য দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। লর্ড ক্লাইব পুনরায় বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া সুশাসন সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, এরূপ ক্ষেত্রে অরাজক রাজ্যে দুষ্ট দমন করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার।*

মোগল শাসন ভাসিয়া গিয়াছে, ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, বাহুবলই সকল তর্কের একমাত্র মীমাংসক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—এরূপ ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে দস্যু তস্করের উপদ্রব প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অরাজক রাজ্যে শান্তি সুখ তিষ্ঠিতে পারিল না;— বিধবার অশ্রুধারা, অনাথের আর্তনাদ, দুর্বলের কাতর ক্রন্দন, অসহায়ের হাহাকারে, রাণী ভবানী নিত্যই মর্মপীড়িত হইতে লাগিলেন। অল্পদর্শী লোকে রাষ্ট্রবিবর্তনের এই সকল প্রত্যক্ষ কুফল দর্শন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের

---

influence in their country, which is torn to pieces by a set of rascals, who in Calcutta walk in rags, but when they are set out on gomastaships, lord it over the country, imprisoning the ryots and merchants, and writing and talking in the most insolent, domineering manner to the fouzdars and officers.

* "In a country where money is plenty, where fear is the principal of government, and where your arms are ever victorious, it is no wonder that the lust of riches should readily embrace the proferred means of its gratification, or that the instruments of your power should avail themselves of their authority, and proceed even to *extortion* in those cases where simple corruption could not keep pace with their rapacity. Example of this sort, set by superiors, could not fail of being followed in a proportionate degree by inferiors. The evil was contagious, and spread among the civil and military, down to the writer, the ensign and the free merchant.'—*Clive's letter*.

উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রজার সুখেই জমিদারগণের সুখ;—প্রজার সর্বনাশ সমুপস্থিত হইয়া জমিদারদলকেও বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহারা রাষ্ট্র-বিপ্লবে লাভবান হইবেন বলিয়া সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু লাভ দূরে থাকুক, অন্তর্বিপ্লবের তুমুল তরঙ্গে প্রাচীন জমিদার-বংশ নিমজ্জিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। রাণী ভবানীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল;—খাল কাটিয়া কুম্ভীর আনিবার ফল ফলিল, সমুদ্রমন্থনে অমৃতকুম্ভের পরিবর্তে হলাহল ভাসিয়া উঠিল!

এই সকল অপূর্ব বিড়ম্বনার মধ্যে হিন্দু মহিলার পক্ষে রাজসাহীর ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করা কত দূর কঠিন, তাহা বিবেচনা করিলে, সেকালের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাণী ভবানী এরূপ অন্তর্বিপ্লবের মধ্যেও হতাশ হইয়া আত্মকর্তব্য পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ববৎ প্রজাপালনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাণী ভবানীর চেষ্টায় রাজসাহী রাজ্যে কিয়ৎপরিমাণে সুশাসন বর্তমান ছিল; কিন্তু তাহাও যায়-যায় হইয়া উঠিতে লাগিল!

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. আসল=আসল জমা অর্থাৎ ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত (Revenue Settlement)।

২. আবওয়াব=বাড়তি ভূমিরাজস্ব (cess)।

৩. মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে আবওয়াবের পরিমাণ ছিল দু লক্ষ আটান্ন হাজার আট শ সাতান্ন টাকা। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার পঁচানব্বই টাকা।

৪. মীরজাফরের পদচ্যুতির পর, তাঁহার জামাতা মীরকাশেম ইংরেজ কোম্পানির উদ্যোগ এবং অনুমোদনক্রমে যখন বাংলার মসনদলাভ করেন তখন (১৭৬০) নতুন নবাব বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের জমিদারীস্বত্ব কোম্পানিকে দান করেন।

৫. ৩রা মে, ১৭৬৫ খ্রীঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দেশের কথা

রাণী ভবানীর শাসন-সময়ে এ দেশে গোব্রাহ্মণসেবার যথেষ্ট সমাদর ছিল। লোকে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া কবচাকারে সাগ্রহে অঙ্গে ধারণ করিত; পীড়া বা যন্ত্রণার সময়ে ভক্তিভরে সর্বৌষধিরূপে সেবন করিত, এবং যাত্রাকালে মস্তকে স্থাপন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইত।

দেশের অধিকাংশ লোকেই শাক্তমতাবলম্বী হইলেও, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্যানুশিষ্যবর্গের পাদপূজার অভাব ছিল না; বরং জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাদুর্ভাব অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হইত।

নদীয়ার ও নাটোরের রাজবংশ শাক্তমতাবলম্বী বলিয়া, রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে রাজানুকম্পায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সুরার উপাসনাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"রাজসাহী শাক্ত সমাজের লীলাভূমি; ইহার গ্রামে গ্রামে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল, এবং তদুপলক্ষে সুরার উপাসনাও বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল!" রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপি শাক্তমতেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় গৌরাঙ্গদেবের জন্মভূমিতেও শাক্তমতের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। সভাপণ্ডিত আগমবাগীশ মহাশয় দীপান্বিতা-শ্যামা-পূজা ও জগদ্ধাত্রী-পূজার প্রচলন করিয়া, শাক্তোৎসবের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজসংস্কারের চেষ্টা আজকাল নূতন প্রচলিত হয় নাই। রাণী ভবানীর সময়েও দুইটি কঠোর সমাজ-নিয়মের সংস্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তৎকালে পূর্ব-বাঙ্গলার বিক্রম-

পুরের পণ্ডিতসমাজ, এবং পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ সর্বপ্রকার সামাজিক আচারপদ্ধতির নিয়ামক হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূর্ব-বাঙ্গলায় প্রাচীন স্মৃতি ও নবদ্বীপাঞ্চলে রঘুনন্দন স্মার্তশিরোমণি[১] মহাশয়ের অষ্টবিংশতিতত্ত্বাত্মক নব্যস্মৃতির সমাদর দেখিতে পাওয়া যাইত। এই সময়ে বাঙ্গলাদেশের সকল স্থানেই গৌরীদান, বিধবার ব্রহ্মচর্য ও সহমরণপ্রথা দৃঢ়সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ইহাতে কোনও কোনও বিষয়ে সমাজশাসনের সুব্যবস্থা হইলেও, কোনও কোনও বিষয়ে বড়ই মর্মান্তিক দুঃখক্লেশের কারণ সংঘটিত হইয়াছিল। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার গৌরীদানের পর সে যদি দৈববশে বিধবা হইত, একাদশীর দিনে আত্মীয় বান্ধবগণকে জীবন্মৃতাবস্থায় নিশাযাপন করিতে হইত;—ধর্মরক্ষার আশায় বালবিধবাকে গৃহাভ্যন্তরে অর্গলরুদ্ধাবস্থায় রাখিয়া, পিতা মাতা কত ক্লেশে নিশাতিপাত করিতেন, তাহা কল্পনা করিতেও সাহস হয় না!

রাণী ভবানীকে এই নিদারুণ যন্ত্রণা বহন করিতে হইয়াছিল। তিনি পরম সমারোহে তারা ঠাকুরাণীর গৌরীদান করিয়াছিলেন; কিন্তু বালিকার জ্ঞানোদয় হইবার পূর্বেই তাহাকে ব্রহ্মচর্যের নির্মম নিয়মের অধীন হইতে হইয়াছিল! বালিকার পক্ষে একাদশী ব্রতের কঠোর নিয়ম পরিপালন করা সহজ নহে; রাণী ভবানীকে তাহার জন্য মর্মপীড়া ভোগ করিতে হইত। তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, মধ্যবঙ্গেও একাদশী ব্রতকে সহজসাধ্য করিবার আশায়, পণ্ডিতসমাজের ব্যবস্থা সংগ্রহের আয়োজন করিয়াছিলেন। একালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ দীর্ঘাতিদীর্ঘ উপাধিলাভ করিতেছেন, অনেকেই কমলার কৃপায় মর্মরখচিত হর্ম্যতলে বাস করিয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি পঞ্চযজ্ঞ সাধন করিয়া, হিন্দুসমাজের পূজার পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের এরূপ সাংসারিক সৌভাগ্যের মুখদর্শন করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নত জীবনে নির্ভীক স্বাধীন সত্যানুরাগ ও তেজস্বিতা ছিল। রাণী ভবানী অর্ধবঙ্গা-

ধিকারিণী প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী হইয়াও, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতে সক্ষম হন নাই ;—তাঁহারা স্মার্তশিরোমণির বহুকাল-প্রচলিত দেশাচারের সংস্কার করিতে সম্মতিদান করিলেন না !

এই সময়েই বিধবাবিবাহের প্রস্তাব প্রথমে উত্থাপিত হয়। বর্তমান যুগের প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ স্বনামখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় যাবজ্জীবন যে সামাজিক মহাসমরে লিপ্ত হইয়া বীরের ন্যায় আত্মমতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সেকালের একজন বাঙ্গালী জমিদার সর্বপ্রথমে সেই সামাজিক মহাসমরের ঘোষণা করেন।

"বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্রসমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণবয়স্কা কন্যার বৈধব্যযন্ত্রণাদর্শনে, যৎপরোনাস্তি ব্যথিতহৃদয় হইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।"২*

বলা বাহুল্য যে, রাজা রাজবল্লভের এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু কি জন্য, কাহার দোষে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না, "ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিতে" তাহার জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে উক্ত জনশ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব পশ্চিম নানা অঞ্চ-লের পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ তৎকালে ঢাকার নবাব ও প্রভূতক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, অনায়াসেই নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণেরও নিকট ঐরূপ ব্যবস্থা পাইব ' তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে উপনীত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র অতীব আদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্টসাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদনন্তর সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত—কার্তিকেয়চন্দ্র রায়।

প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে গোপনে রাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থা দেখাইলেন। তাঁহারা ইহা পাঠকরণান্তর 'এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত' কহিলেন। ইহা শ্রবণমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিরতিশয় ঈর্ষাদগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন, 'এ ব্যবস্থা শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া রাজবল্লভকে নিরস্ত করিতে হইবে। একজন বৈদ্যজাতীয় যে এই চির-অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করিয়া যাইবেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় নহে। কিন্তু, এক্ষণে রাজবল্লভের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে আমি তাঁহাকে কোন মতেই বিরক্ত করিতে পারি না। অতএব তাঁহার সন্তোষার্থ আমি আপনাদিগকে এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করিব, এবং আপনারা অসম্মত হইলে আপনাদের প্রতি তাড়নাও করিব। আপনারা এই কহিবেন যে, মহারাজ বা কাহারও অনুরোধে আমরা এরূপ ব্যবস্থা দিয়া পাপগ্রস্ত হইতে পারিব না'।"

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু পণ্ডিতগণকে করতলগত করিতে পারিলেন না। তখন স্বনামখ্যাত গোপাল ভাঁড়[৩] কৌশলে কার্যোদ্ধার করিবার জন্য বিক্রমপুরাগত পণ্ডিতবর্গের নৌকায় তাঁহাদের আহার্য দ্রব্য বহন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতেরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, আহার্য মধ্যে একটি গোবৎসও আনীত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় গোপাল ভাঁড় বলিলেন যে, গোমাংসভক্ষণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, অতএব ইহাও ভোজন করিতে হইবে। তখন পণ্ডিতগণ পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবসুলভ সংস্কারবশতঃ বলিয়া উঠিলেন—'শাস্ত্রসম্মত হউক, ব্যবহারবিরুদ্ধ কার্য কিরূপে সম্পাদন করিব?' গোপাল অবসর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'তবে আর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে আসিয়াছেন কেন? তাহাও ত ব্যবহারবিরুদ্ধ!'

অতঃপর বিক্রমপুরাগত পণ্ডিতমণ্ডলী নবদ্বীপে অবস্থান করা নিরর্থক ভাবিয়া রজনীযোগে পলায়ন করায় বিধবাবিবাহের আন্দোলন এইখানেই পরিসমাপ্ত হইল।

ইহা অবশ্যই জনশ্রুতিমাত্র। কিন্তু এই জনশ্রুতিতে সেকালের

পণ্ডিতসমাজের ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বভাবের যেরূপ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে, তাহা সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।[৪] সেকালের পণ্ডিতমণ্ডলীর ন্যায় পণ্ডিত এখন কোথায়? কিন্তু সেকালের কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় জমিদারের যে একালেও অভাব হয় নাই, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ বর্তমান যুগের রাজবিধির' কল্যাণে বৈধবিবাহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্তু ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া আজিও ইহা হিন্দুসমাজে স্থানলাভ করিতে পারে নাই।

একালের বিধবাদিগের দুঃখের অবধি নাই;—তাহার প্রধান কারণ এই যে, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও তাহারা পরমুখাপেক্ষিণী হতভাগিনীর ন্যায় কত তাড়না সহ্য করিতে বাধ্য হয়! জীবিকার্জনের উপায় না থাকায় একালের নিরাশ্রয়া বিধবাদিগকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। সেকালে এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সুবিধা ছিল। দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত; বিধবাগণ তাহা হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইত। এ দেশের তন্তুবায়গণ ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে; কার্পাসের কথা এখন অভিধানে অধ্যয়ন করিতে হইতেছে; সুতরাং পল্লীরমণীগণের পক্ষে শ্রম-লব্ধ অর্থোপার্জনের সর্বপ্রধান পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

রাণী ভবানী জীবহিতকামনায় নানারূপ পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হতভাগিনী বিধবাদের ভরণপোষণের জন্যও গঙ্গাতীরে আশ্রয়-স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার আশ্রয়ে বহুসংখ্যক বিধবা গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইত।

এই সময়ে রাজসাহী রাজ্যে কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকগণ বাঙ্গলাদেশের নানা-স্থান হইতে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া ইউরোপে বিক্রয় করিতেন, এবং যথাকালে বস্ত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তন্তুবায়গণকে 'দাদন' অর্থাৎ অগ্রিম মূল্য প্রদান করিতেন। ইহাতে যাহাদের কিছুমাত্র মূলধন ছিল না, তাহারাও দাদনের কৃপায় বস্ত্রবয়নে অগ্রসর হইয়াছিল।

এই সকল বস্ত্রের এক একটি আড়ং অর্থাৎ বিক্রয়স্থান নির্দিষ্ট ছিল ; তন্তু-বায়গণ তথায় বিক্রয়ার্থ বস্ত্র আনয়ন করিত। রাজসাহী রাজ্যে এইরূপ বহু-সংখ্যক আড়ং[৫] ছিল ;—ইংরাজেরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রত্যেক আড়ং হইতেই তাঁহারা বৎসরে ১৪৮১০০ খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেন। রাজ-পুরুষেরা বলেন যে,—রাণী ভবানীর রাজ্যে বিংশতি লক্ষ লোকের বসতি ছিল। যে রাজ্যে বিংশতি লক্ষ লোকের পরিধেয় প্রস্তুত হইয়া লক্ষ লক্ষ বস্ত্র ইউরোপীয় বণিকের নিকট বিক্রীত হইত, সে রাজ্যে প্রজার লক্ষ্মীশ্রী কিরূপ ছিল? সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই ; এখন রাজসাহীতে বিলাতী কাপড়েরই একাধিপত্য!

রাণী ভবানীর শাসনসময়ের শেষদশায়, দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের তিরো-ধানের সূত্রপাত হয়। ইংরাজেরা পরাক্রান্ত হইয়া অল্পমূল্যে ক্রয় ও বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া কারবারে লাভবান হইবার আশায় দেশের লোকের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করায়, মীরকাশিমের সময়ে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মীরকাশিমের পরাজয়ে ইংরাজেরাই সর্বেসর্বা হইলেন, সুতরাং তাঁহাদের কর্মচারিবর্গ কোম্পানীদত্ত নির্দিষ্ট বেতনে সন্তুষ্ট না হইয়া, গোপনে ও প্রকাশ্যে বাণিজ্যবাপারে অর্থোপার্জনে লিপ্ত হইতে লাগিলেন। যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া উঠিলেন ;—বিদেশীয় বণিকসমিতির অর্থপিপাসা শান্ত করিবার জন্য দেশের লোকের শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল ; লোকে ক্রমে ক্রমে একমাত্র কৃষিকার্যের উপরেই একান্ত নির্ভর করিতে বাধ্য হইল।

১১৭৭ সালের মন্বন্তরে বাঙ্গলার যে সর্বনাশ সংসাধিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্প্রতি স্যর উইলিয়ম হণ্টার প্রণীত বঙ্গবিবরণীর সমালোচনায় ইহাকেই তাহার একতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।*

* The appalling blunders of the first administrators, the ruin of the old aristocracy of Bengal, the ruin of internal trade under a system pursued for the profit of the Company's

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রাজসাহী প্রদেশে নানাবিধ চাউল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত ; তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে নীল, তামাক, খর্জ্জুরী শর্করা ইত্যাদিরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা এই সকল শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া সমুদ্রপথে নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন করিত। একবার ইংরাজেরা দেশীয় বণিক্গণের বাণিজ্যপোত লুণ্ঠন করায়, নবাব আলিবর্দীর আজ্ঞায় তাঁহাদিগকে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছিল।† ইংরাজেরা সর্বেসর্বা হওয়ায় তাঁহাদিগকে আর শাসন করিবার কেহ রহিল না ; অগত্যা বাঙ্গালীর বহির্বাণিজ্য দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিল !

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রঘুনন্দন শিরোমণির আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতক।

২. রাজবল্লভ বাংলায় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর নিজ কন্যা অভয়া মাত্র ন'বছর বয়সে বিধবা হন। তিনি বাংলার তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতদের মতামত সংগ্রহ করতে শুরু করেন। বাংলার পণ্ডিতদের একাংশ অক্ষত-যোনি কন্যার পুনর্বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে বাংলার হিন্দুসমাজের অপর নেতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর এই প্রচেষ্টার বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। তাঁর নেতৃত্বে নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বিধবা-বিবাহে আপত্তি জানালেন। সমাজসংস্কারে রাজবল্লভের [দ্বিতীয়] প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল।—ডঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়—প্রাক্-পলাশী বাংলা, পৃ. ২১।

servants and gomastahs, and desertion of villages and fields under the misrule of the years immediately preceding the Famine, all these were important and accelerating causes which have been darkly hinted at but not fully told by the historian of the Famine of 1770.—*R. C. Dutt Eqr. C. S., Professor of Indian History, University College, London.* (*Quoted from* '*India*', 25 March (1898)

† Long's *Selections from the Records of the Government of India*, Vol. I, Record No. 46.

৩. সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধানের মতে : "নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ও হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্পগুলির স্রষ্টা সম্ভবত একজন নয়।" পৃ. ১৩৩।

৪. বিধবা-বিবাহের উদ্যোগে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিরোধিতার প্রসঙ্গে কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশের কোন কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে যেরূপ সর্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার যে প্রকার প্রভুত্ব ছিল, তাহাতে বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহারমূলক অনেক বিগর্হিত রীতি নিরসন ও হিতজনক রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া বরং যাহাতে ঐ পূর্ব কুরীতি বলবতী থাকে, তৎপ্রতিই সর্বদা যত্ন করিয়াছেন এবং অন্য কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি স্বদেশের কোন দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান হইলে, তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন।" 'প্রাক্-পলাশী বাংলা'য় উদ্ধৃত, পৃ. ২১-২২।

৫. রাণী ভবানীর জমিদারির মধ্যে মালদহ, হরিয়াল, শেরপুর, বালিকুশি ও কাগমারী উন্নত ধরনের বস্ত্রশিল্প উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মন্বন্তর §

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব বিলাতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে,—"আমরা আরও কিছুদিন দেশীয় শাসনপ্রথার পদানত থাকিয়া, স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তৃগণের লুণ্ঠন ও অপমান সহ্য করিয়া, সামান্য বণিক্-সমিতির মতই নীরবে ভারতবর্ষে অবস্থান করিব, অথবা এখন হইতেই তরবারি হস্তে কোম্পানীর ক্ষমতা ও রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত হইব,—ইহার কোন্ পথ কোম্পানীর পক্ষে কল্যাণকর, তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পরিণামফল যাহাই হউক, একবার যখন শত্রুতাসাধন করিয়া এত দূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন প্রত্যেক যুদ্ধে, প্রত্যেক গুপ্ত-মন্ত্রণায় কোম্পানীর অধিকার সঙ্কটময় হইয়া উঠিতেছে। ইহার গতি-রোধ করিতে হইলে, কোম্পানীর শাসন সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন করা আবশ্যক, এবং আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই যুক্তিযুক্ত।" *

লর্ড ক্লাইব এইরূপ ভণিতা করিয়া লিখিলেন,—"নবাবের সহিত কোম্পানীর কর্মচারিবর্গের সর্বদাই যে সকল কলহ বিবাদ উপস্থিত হইতেছে, এবং যে সকল অত্যাচার উৎপীড়নের কথা পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হইতেছে, তাহাতে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার 'দেওয়ানী সনন্দ' গ্রহণ করা ভিন্ন সে সকল অসুবিধার মূলোচ্ছেদ করিবার উপায়ান্তর নাই! দিল্লীশ্বরকে বাহুবলে সিংহাসনে সংস্থাপন করায়, তিনি সিংহাসনরক্ষার আশায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে 'দেওয়ানী সনন্দ' প্রদান করিতে চাহিতেছেন। দেওয়ানী আর কিছুই নহে,—প্রজার নিকট রাজ-

§ এই পরিচ্ছেদের অধিকাংশ বিষয় ইতিপূর্বে 'মন্বন্তর' শীর্ষক একটি পৃথক প্রবন্ধে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনবোধে, ইহাতে কেবল প্রসঙ্গক্রমে মন্বন্তরের উল্লেখমাত্রই রহিল।

* *Clive's letter to the Court of Directors.*

কর সংগ্রহ করিয়া নবাব নাজিমের ব্যয় সংকুলনার্থ যাহা প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন অবশিষ্ট রাজস্ব দিল্লীশ্বরকে পাঠাইয়া দিতে হইবে।"†

বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারের সদস্যগণ বহুদূরে,—ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানেন না; তথাপি তাঁহারা শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত ছিলেন না; বাণিজ্যরক্ষাই তাঁহদিগের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা ক্লাইবের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "দেশশাসন ও বিচারকার্যে যেন লিপ্ত হইতে না হয়।"‡

এ দেশের ইংরাজেরা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। লর্ড ক্লাইব 'পুণ্যাহ'[১] করিয়া প্রকারান্তরে সর্বময় শাসনকর্তা হইয়া উঠিলেন। ইহাতে কোম্পানীর বাণিজ্যব্যাপারের দিকে কর্মচারিবর্গের আর সেরূপ মনোযোগ রহিল না; তাঁহারা রাজ্যেশ্বর হইয়া এক একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। বর্ষশেষে বিলাতে আয়ব্যয়ের বিবরণী প্রেরণ করিবার সময়ে ক্লাইবকে স্বীকার করিতে হইল যে, কোম্পানী দেওয়ানী লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি লিখিলেন,—"জমিদারবর্গ রাজস্বদান না করিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া থাকেন; ইহার গতিরোধ না করিলে দেওয়ানীর আয়ে ব্যয় সংকুলন হইবে না, জমিদারেরাও স্বস্বপ্রধান হইয়া উঠিবেন!"*

ক্লাইব জমিদারদলকে করসংগ্রাহক রাজকর্মচারী বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের স্থলে নতুন করসংগ্রাহক নিয়োগ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। এমন সময়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করায় তিনি স্বহস্তে জমিদারগণকে পদচ্যুত করিতে না পারিয়া স্বদেশ হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"বাঙ্গলাদেশে কিরূপ আকারে রাজ্যতন্ত্র গঠিত হইবে, তাহাই সর্বপ্রথম কথা। দেওয়ানী-সনন্দ-বলে কোম্পানীই দেশের রাজা হইয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। নবাবের আর সে

† *Long's Selections,* Record No. 833.

‡ *Ditto*—Record No. 861.

* *Ditto*—Record No. 885.

ক্ষমতা নাই,—তিনি এখন ক্ষমতা ও উপাধির পুরাতন ছায়াতলে বসিয়া বসিয়া কায়ক্লেশে দিনপাত করিতেছেন। তথাপি আমরা যে এই ছায়াকে মান্য করি, কিছুদিনের জন্য এইরূপ ভাব রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের পক্ষে কর্তব্য বোধ হইতেছে।" †

এই রাজনীতির অনুসরণ করিতে গিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ "দ্বিত্বশাসন"‡[২] সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। যিনি নামতঃ শাসন-কর্তা, কার্যতঃ তাঁহার কোনই ক্ষমতা রহিল না; যাঁহারা কার্যতঃ প্রভু, তাঁহাদের কোনরূপ শাসন-দায়িত্ব সংস্থাপিত হইল না! বাঙ্গলাদেশ ক্রমেই মহাবিপ্লবে বিপর্যস্ত হইতে লাগিল।

প্রজাপালন সর্বপ্রধান রাজধর্ম,—তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। ইংরাজরা প্রজার উপর উৎপীড়ন করিলে, এবং তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণীকৃত হইলেও, নবাব বা জমিদারগণ তাহার নিবারণ করিতে পারিলেন না। ইংরাজ বণিক ও তাঁহাদের অগণ্য কর্মচারিবর্গ যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন বিখ্যাত ইংরাজ ইতিহাসলেখক এই সকল কথার উল্লেখ করিবার সময়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"প্রজার একমাত্র অপরাধ এই যে, তাহারা গোমস্তাবর্গের অর্থলালসা পূর্ণ করিতে পারিল না; সেই অপরাধে ইংরাজের গোমস্তাবর্গ এরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল যে, নবাব ও তাঁহার কর্মচারিগণকে ভয়-প্রদর্শনে বশীভূত করিয়া গোমস্তারাই বিচারক সাজিয়া উৎপীড়িত প্রজা-পুঞ্জকে দণ্ডদান করিতে লাগিল!"* ইংরাজ-ইতিহাসলেখক কেবল দেশীয় গোমস্তাগণের উপরেইসকল দোষনিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু ডিরেক্টারগণ

† *Clive's letter to the Select Committee 1776.*

‡ *Double Government.*

* The Government of the country, as far as regarded the protection of the people, was dissolved. Neither the Nabob nor his officers dared to exert any authority against the English, of whatsoever injustice or oppression they might be guilty. The

তজ্জন্য ইংরাজ কর্মচারিগণকেও অপরাধী করিয়া গিয়াছেন।*

শ্রমলব্ধ ধনধান্য নিরুদ্বেগে উপভোগ করিতে না পারিলে শ্রমে প্রবৃত্তি জন্মে না। জনসমাজের ধনবল বৃদ্ধি করিতে হইল শ্রমে প্রবৃত্তি দিতে হয়, তজ্জন্য শ্রমলব্ধ ধনভোগের ব্যবস্থা করিতে হয়, অপহারককে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শ্রমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। অরাজকতায় রাজশাসন শিথিল হইয়া দেশের লোকের দুর্দশার অবধি রহিল না। তাহারা প্রধান প্রধান শিল্পবাণিজ্যের আড়ং হইতে দূরদূরান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল; অনেকে শিল্পবাণিজ্য পরিহার করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া নির্জনে মাথা লুকাইয়া দিনপাত করিতে লাগিল; বাঙ্গালীর গৃহস্থালীর গৌরব তিরোহিত হইয়া গেল। কৃষকপল্লীতে আর শস্যসঞ্চয়ের আড়ম্বর রহিল না; মহাজন-দিগের পণ্যশালায় আর শস্যভার বাহিত হইতে পারিল না। লোকে কোনরূপে কায়ক্লেশ সশঙ্কচিত্তে দিনাতিপাত করিতে লাগিল।

বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম এবং চব্বিশ-পরগণার পুরাতন জমিদার-গণকে তাড়িত করিয়া কোম্পানী বাহাদুর যে নূতন জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজের "খাস তহশিল" আরম্ভ হইল; অন্যান্য স্থান মহম্মদ রেজা খাঁর[৩] নায়েব-দেওয়ানীর অধীন রহিল। জেলায় জেলায় রাজস্ববিভাগের কার্যপরিদর্শনার্থ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়েক জন ইংরাজ "সুপারভাইজার"[৪] নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা দেশের

gomastas or Indian agents employed by the company's servants, not only practised unbounded tyranny, but overawing the Nabob and his highest officers, converted the tribunals of justice themselves into instrument of cruelty, making them inflict punishment upon the very wretches whom they oppressed, and whose only crime was their not submitting with sufficient willingness to the insolent rapacity of those subordinate tyrants.—J. Mill's *History of British India*, Vol. III, 435-436.

† *Letter from the Court of Directors*, 28 August, 1771.

রীতি, নীতি, অবস্থা ও ইতিহাসসঙ্কলনের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বসংগ্রহের পরিদর্শনভার প্রাপ্ত হইলেন !*

যাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবের মূল, তাঁহাদের সকলকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল ;—মীরজাফর, মীরণ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, সকলেই নানা ক্লেশে জীবন বিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; প্রজাপুঞ্জ এতদিন একরূপ নিরুদ্বেগেই কালাতিপাত করিতেছিল ; কিন্তু তাহাদেরও প্রায়শ্চিত্তকাল সমুপস্থিত হইল !

বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ। সাতাত্তরের 'মন্বন্তরে' সেই অন্ন দুর্লভ হইয়া উঠিল ; লোকে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। প্রাচীন জমিদারবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। পথঘাট নদীতীর শবদেহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষশেষে স্থির হইল যে, 'মন্বন্তরে' বাঙ্গালীর সর্বনাশ হইয়াছে,—হলকর্ষণক্ষম কৃষক জীবিত নাই, বীজধান্য ও গোবৎসের অভাব হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র তৃণকণ্টকে পূর্ণ হইয়াছে, গ্রাম নগর বিজন বনে পরিণত হইয়াছে !

দীনপালিনী রাণী ভবানী এই দুর্দিনে রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া প্রজারক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু কোটী লোক তাঁহার কৃপায় অন্নজল লাভ করিয়াছিল ; কিন্তু সকল শক্তিরই সীমা আছে। মন্বন্তরের সহিত সংগ্রাম করিতে গিয়া রাণী ভবানী আত্মশক্তির্ সীমা দর্শন করিলেন। রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল, তথাপি প্রজারক্ষার উপায় হইল না। দুর্ভিক্ষাবসানে রাজসাহীর সম্পন্ন জনপদ শ্মশান হইয়া গেল। অতুল-ঐশ্বর্যশালিনী রাণী ভবানী শূন্যহস্তে ঊর্ধ্বনেত্রে দেশের দুর্দশার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. পুণ্যাহ—বৈশাখ মাসে ভূমিরাজস্ব-বিভাগের শুভ নববর্ষের অনুষ্ঠান।

২. ক্লাইভ-প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা (১৭৬৫ খৃঃ) দ্বিত্ব অথবা দ্বৈতশাসন

* W. W. Hunter—*Annals of Rural Bengal.*

(Dyarchy or Double Government) নামে পরিচিত।

৩. রেজা খাঁ ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীর অনুমোদনক্রমে বাংলার নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসনকালেই বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল।

৪. Supervisor-দের প্রথম নিয়োগকাল ১৭৬১ খ্রীঃ। 'Their instructors ordered them to prepare a rent roll, and by enquiry to ascertain the fact from which a just and profitable assessment of the revenue could be made. Such instructions were impossiable to carry out. —*Cambridge History of India*, Vol. V, p. 411.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাবাস

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে। তাঁহার শাসনকাহিনী অবলম্বন করিয়া কত পুস্তক রচিত হইয়াছে; তাঁহার অত্যাচার-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া কত বাগ্মী যশস্বী হইয়াছেন; তথাপি এখনও তাঁহার কথা লইয়া লেখকসমাজে কত বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে! তাঁহার রোহিলাধ্বংসের, চেৎসিংহ-নির্যাতনের, বেগম-লুণ্ঠনের বা নন্দ-কুমার-হত্যার কাহিনীর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বর্তমান গ্রন্থের কোনও সংস্রব নাই। তাঁহার নিকট রাণী ভবানী কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই একমাত্র আলোচ্য বিষয়। কারণ, হেষ্টিংসের ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়াই প্রতিভাশালিনী অর্ধবঙ্গাধিকারিণী রাণী ভবানী পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং গঙ্গাবাস আরম্ভ করেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল, ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি নূতন লোক নহেন; যৌবনে কাশিম-বাজারের ইংরাজ কুঠির মোহরের-রূপে এদেশে আসিয়া, নানা সময়ে নানাবিধ রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া, অবশেষে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে চিনিত, তিনিও এ দেশের প্রধান প্রধান রাজবংশের অধীশ্বরকে জানিতেন। বিলাতের লোকে ভাবিত, তাঁহার মত ভারতজ্ঞ লোক আর নাই; সেই পরিচয়ে তিনি সর্বোচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তখন তাঁহার এমন দৈন্যদশা যে, ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে ব্যয়-সংকুলনার্থ তাঁহাকে ঋণগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।*

ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, ৪ঠা মে হইতে ক্লাইবের শাসননীতি প্রবর্তিত করিবার জন্য, ওয়ারেণ হেষ্টিংস কোম্পানীর খাস শাসনের

* Rulers of India—*Warren Hastings.*

সূচনা করিলেন। এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে, কোম্পানী বাহাদুরকে সাক্ষাৎভাবে জমিদারদিগের সংস্রবে আসিতে হইল।

ইংরাজেরা এ দেশের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিবার সময়ে জমিদার-দিগের, প্রকৃত মর্যাদা নিরূপণ করিতে পারেন নাই; তাঁহারা জমিদার-গণকে কর-সংগ্রহকারী রাজকর্মচারিমাত্রই মনে করিয়াছিলেন। উত্তর-কালে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু হেষ্টিংস যখন প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানীর শাসন প্রচলিত করেন, তৎ-কালে এ বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় নাই। সকলেই বুঝিয়া-ছিলেন যে, রাজস্ব-সংগ্রহ করাই কোম্পানীর সর্বপ্রধান লক্ষ্য; তজ্জন্য পুরাতন জমিদারগণকে পদচ্যুত করিতে কাহারও কোনরূপ দ্বিধাবোধ হয় নাই।

কোম্পানীর "খাস তহশিল" প্রবর্তিত করিয়া হেষ্টিংস রাজস্ব-সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন। মিডল্‌টন, ডেকার, লরেল ও গ্রাহাম নামক চারি জন সদস্য লইয়া, হেষ্টিংস একটি সমিতি গঠন করিলেন; ইহারই নাম "স্যরকিট কমিটী"। পরগণায় পরগণায় পরিভ্রমণ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য সমগ্র জমিদারীর করসংগ্রাহক নিয়োগ করিবার জন্যই এই কমিটীর উৎপত্তি হয়। সেকালের লোকে ইংরাজি জানিত না; তাহারা ইংরাজি শব্দাদি সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য উচ্চারণবিকৃতিবলে দেশীয় ভাষায় তাহার প্রতিশব্দ গঠন করিয়া লইত। অদ্যাপি এইরূপ অনেক অদ্ভুত শব্দ-গঠনকৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অভ্যাসদোষে সেকালে লোকে "সুপারভাইজারের" নাম করিয়াছিল, "শূয়োর ভাই"। এক্ষণে "স্যরকিট" সংস্থাপিত হওয়ায় তাহার নাম রাখিল "ছরকট"। এই স্যরকিট কমিটী যেরূপে রাজ-স্বনির্ধারণ কার্য সুসম্পন্ন করেন, তাহাতে অনেক "ছরকট" সংঘটিত হইয়াছিল। ইতিহাস পড়িয়া মনে হয় যে, লোকে ব্যঙ্গ করিয়া ইহার যেরূপ নামকরণ করিয়াছিল, কার্যতঃ তাহা একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

কমিটী প্রথমে নদীয়ার রাজেন্দ্র বাহাদুরকেই ধরিয়া বসিলেন; তাঁহারা কৃষ্ণনগরাধিপতির রাজ্যের যে পরিমাণ রাজস্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মত না হইলে, রাজ্য অন্যের হস্তে সমর্পিত হইবে, এই সংবাদে কৃষ্ণচন্দ্র একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। পলাশির যুদ্ধাবসানে কামান ও রাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া যে কৃষ্ণচন্দ্র দুই হাত তুলিয়া ইংরাজকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, তিনি এখন সেই দুইখানি হাতে কৃতাঞ্জলি হইয়াও কমিটীর মতিপরিবর্তন করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া অগত্যা কমিটীর প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রের নামে ১৭৭৩ হইতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চারি বৎসর মেয়াদে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।*

কমিটীর সদস্যগণ নদীয়া হইতে কাশিমবাজার ও কাশিমবাজার হইতে রাজসাহীতে উপনীত হইলেন। রাণী ভবানী তাঁহাদের আদর ও অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না; কিন্তু ইহাতে বিশেষ ফলোদয় হইল না। যে রাজ্যে রাণী ভবানী জীবন-মরণের বিচারকর্ত্রী অন্নদাত্রী কল্যাণবিধাত্রী মহাদেবী, সেই রাজ্যের বুকের উপর কোম্পানীর ঢোল ভীমকলরবে ঘোষণা করিল, সে রাজ্য আর রাণী ভবানীর নহে; যে অধিক রাজকর দিতে অগ্রসর হইবে, রাজমুকুট তাহারই।

অভিমানিনী রাণী ভবানীর রাজ্যাভিমান বিদূরিত হইল; তেজস্বিনী বীর-রমণীকে নানা উপায়ে হেষ্টিংসের তুষ্টিসম্পাদন করিয়া রাজ্য-রক্ষার্থ কমিটীর প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। কিরূপে ইহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা হেষ্টিংসের স্বহস্তলিখিত সমসাময়িক কার্যবিবরণী হইতে অনুবাদিত হইল,—

"কৃষ্ণনগর প্রদেশের রাজস্বনিরূপণের সময়ে যে যে নিয়মে কার্য-সম্পাদন করা হইয়াছিল, রাজসাহী ও হুজুরি জেলাতেও তাহারই অনুসরণ করা হইল। রাজসাহী রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরগণা কে কত

* কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়—ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহে, তাহা জানিবার জন্য প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া উপযুক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা হইয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলের পরগণাগুলি অন্য লোক যত টাকায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে চাহে, তদপেক্ষা রাণী ভবানীর প্রস্তাবানুযায়ী বন্দোবস্ত করাই লাভজনক বোধ হইল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গেই পাঁচ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাঁহার ধনবল আছে, বিশ্বাসপাত্রী বলিয়া লোকসমাজে সুখ্যাতি আছে, চরিত্রগুণে তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিবারও কারণ আছে। তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করায় আরও বিশেষ সুবিধা এই যে,—তিনি কমিটীর নির্দেশানুসারে বন্দোবস্তী মহালগুলি চৌদ্দ ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাকালে রাজকর-পরিশোধের অঙ্গীকারে নিজের ও প্রজাবর্গের কবুলিয়ত দাখিল করিতে সম্মত হইয়াছেন। পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে অন্য কেহ বন্দোবস্তের প্রস্তাব উপস্থিত না করায়, তাহাও রাণী ভবানীকেই বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাণী বহু বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া এ দেশের শাসনকার্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে অন্য লোকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে সাহস পায় নাই। রাজসাহীর ন্যায় বহুবিস্তৃত সম্পন্ন রাজ্য হইতে যে পূর্ণমাত্রায় রাজস্ব সংগৃহীত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। প্রাচীন রাজবংশের সহিত বন্দোবস্ত করায়, আমাদের রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যয়বাহুল্যও হইবে না।"*

এই বন্দোবস্ত বাঙ্গলার জমিদারী সেরেস্তায় "পঞ্চসনা" বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। ইহা সুসম্পন্ন হইলে কমিটীর সদস্য মিডল্‌টন্ সাহেবের উপর মাসে মাসে "কিস্তী কিস্তী" রাজসাহীর রাজস্ব-সংগ্রহের ভার নিক্ষিপ্ত হইল। রাণী ভবানী স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, এই সময় হইতেই তাঁহার প্রজাপালন ও পুণ্যকীর্তিসংস্থাপনের ক্ষমতা ও অর্থবল অবসন্ন হইয়া পড়িল। ইহাই রাণী ভবানীর অধঃপতনের মূলসূত্র।

হেষ্টিংসের শত্রুদল অনেক। তাঁহার শাসনসময়ের প্রায় প্রত্যেক

* *Fifth Report.*

কার্যের জন্যই তাঁহার নামের সঙ্গে বহু কলঙ্ক সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। রাণী ভবানীর সহিত তিনি এতদুপলক্ষে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়াও দুইটি কলঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল ;—একটি উৎকোচগ্রহণ, অপরটি রাজ্যাপহরণ।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনসময়ের যে সকল সরকারী কার্য-বিবরণী সম্প্রতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে,* তাহার এক স্থানে লিখিত আছে,—

"The Governor's Banian stands foremost and distinguished by the enormous amount of his farms and contracts, to say nothing of the large* sums standing in his name in the accounts of money received from the Rannies of Rajeshahy and Burdwan which have either been proved by the production of the original papers at the Board, or by witnesses upon oath ; our opinion of Mr. Hastings will not suffer us to think that a participation of profits with his servant would have been *repugnant to his principles*, to assert as he does that it *would have been opposite to his interest* seems too extravagant to deserve an answer."†

নাটোর রাজদপ্তরে রাণী ভবানীর শাসনসময়ের 'সুমার' বা

* *Selections from the Letters, Despatches and other State papers preserved in the Foreign Department of the Government of India 1772—1785, Edited by George W. Forrest B.A. In three volumes. Calcutta 1890.*

† Minutes from General Clavering, Colonel Monson and Mr. Francis—*25 January 1776, Para II.*

হিসাবের কাগজপত্র এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং হেষ্টিংসের উৎকোচগ্রহণের অপবাদ সম্বন্ধে তাঁহার সহযোগিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা সহজ নহে। তবে ক্লেভারিং, মন্‌সন্‌ ও ফ্রান্সিস্‌ নামক সদস্যগণ হেষ্টিংসের শত্রু হইলেও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না; তাঁহারা হেষ্টিংসের সমক্ষে কৌন্সিলের প্রকাশ্য অধিবেশনে যে মন্তব্য-পত্র প্রদান করেন, তাহাতে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ সুস্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। এ দেশের জনশ্রুতিও হেষ্টিংসের অনুকূল নহে। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসলেখকগণ এ সকল কথায় আস্থা স্থাপন না করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রন্থরচনা করিতেছেন।

সেকালে বাৎস্যগোত্রীয় চাঁদ রায় নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাহিরবন্দের জমিদার ছিলেন। চাঁদ রায়ের দশ আনা অংশে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ উত্তরাধিকারী হইয়া রাণী সত্যবতী নাম্নী বিধবা পত্নী বর্তমান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। রাণী সত্যবতী বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়াবাড়ী, স্বরূপবাড়ী, আমবাড়ী, পাতিলাদহ, ইস্‌লামবাড়ী ও সুজানগর,—এই আট পরগণার অধিকারিণী ছিলেন কিন্তু নবাব-সরকারে এইসকল পরগণা রাণী ভবানীরই নামজারী ছিল। তিনি স্নেহপরবশ হইয়া রাণী সত্যবতীকে রাজ্যচ্যুত করেন নাই; পরে সত্যবতীর অভাবে এই সমস্ত পরগণা রাণী ভবানীর রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। হেষ্টিংসের হুকুমে বাহিরবন্দ রাণী ভবানীর হস্তচ্যুত হইয়া গেল।

হেষ্টিংসের শত কলঙ্কের মধ্যে এই রাজ্যাপহরণও একটি সর্বজন-পরিচিত প্রধান কলঙ্ক। বাহিরবন্দ ও তাহার বিচিত্র কাহিনী নানা স্থানে নানা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণীর" কাহিনীও বাহিরবন্দের কাহিনী। আমরা "মুর্শিদাবাদ হিতৈষী"-পত্রে বাহিরবন্দের যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি, তাহাতে সমস্ত ঐতি-হাসিক তত্ত্ব বর্ণিত রহিয়াছে। এ স্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

"বাহারবন্দ রঙ্গপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ পরগণা, কেবল রঙ্গপুর

কেন, সমগ্র বঙ্গরাজ্যের মধ্যে এরূপ বিস্তৃত ও উর্বরা পরগণা অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও ত্রিস্রোতার সলিলসিক্ত হইয়া শ্যামল শস্যরাজিপরিপূর্ণ বাহারবন্দ বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে স্বীয় নাম বিঘোষিত করিতেছে। মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব হইতে ইহার নাম শ্রুত হওয়া যায়। বাহারবন্দ বাঙ্গালা দেশে প্রবাদ-বাক্যের সহিত জড়িত। ইহার পুরাতত্ত্ব জানিতে হইলে, রঙ্গপুর দেশের কিঞ্চিৎ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, কারণ বাহারবন্দ রঙ্গপুরের অনেক অংশ অধিকার করিয়া আছে। রঙ্গপুর পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপের নামান্তর। প্রাগ্-জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত রঙ্গপুর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেন, এবং অর্জুন কর্তৃক নিহত হন। ভগদত্তের বংশীয়েরা অনেকদিন কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পর রঙ্গপুর প্রদেশে পৃথু নামে একজন পরাক্রান্ত রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোদা ও বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। তিনি কীচকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সরোবর-সলিলে জীবন বিসর্জন করেন। পৃথু রাজার পরে বৌদ্ধধর্মালম্বী সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয়গণের রাজত্বের কথা আমরা অবগত হই। দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে পালবংশীয়দিগের অশেষ কীর্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর ও কামরূপ পর্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যের বিস্তার ছিল। সর্বপ্রথমে ধর্মপালের নাম শ্রুত হয়। ধর্মপালের পর গোপীচন্দ্র তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। গোপীচন্দ্রের মাতা মীনাবতী ধর্মপালের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করায় ধর্মপাল কোথায় অন্তর্হিত হন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। গোপীচন্দ্র তৎপরে শূন্যসিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহারবন্দের প্রধান স্থান উলিপুরের পূর্বে ওয়ারী নামক স্থানে গোপীচন্দ্রের ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইত। গোপীচন্দ্রের পুত্রের নাম ভবচন্দ্র, যে ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তার কাহিনী সমগ্র বাঙ্গলায় প্রচলিত, সেই ভবচন্দ্রই

উক্ত গোপীচন্দ্রের পুত্র। ভবচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হইতে পালবংশের অবসান হয়, তাহার পর কোচ প্রভৃতি জাতি কর্তৃক রঙ্গপুর ও কামরূপ বারম্বার আক্রান্ত হয়। পালবংশের পর অন্য একটি বংশের উল্লেখ আছে; সেই বংশে নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর নামে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। নীলাম্বর গৌড়ের বাদসাহ হোসেন সার সময় মুসলমানগণ কর্তৃক পরাজিত হন। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে কামরূপ ও রঙ্গপুর অঞ্চল কোচগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। কোচবংশের স্থাপয়িতার হাজোর হীরা ও জীরা নামে দুই কন্যা ছিল, হীরার গর্ভে বিশু ও জীরার গর্ভে শিশুর জন্ম হয়। বিশু কোচবিহার বংশের এবং শিশু জলপাইগুড়ি রাজবংশের আদিপুরুষ। বিশু স্বীয় পুত্র শুক্লধ্বজ ও নরনারায়ণকে আপনার রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। শুক্লধ্বজের পৌত্র পরীক্ষিত প্রথমে মুসলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন, খৃষ্টীয় ১৬০৩ অব্দে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য পরীক্ষিতের রাজ্য মোগলগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। পরীক্ষিত অতি অল্পমাত্র ভূভাগের অধীশ্বর থাকেন, তাঁহার অবশিষ্ট রাজ্য ঢাকার মোগল শাসনকর্তার অধীন হয়। এই অধিকৃত রাজ্য চারি সরকারে বিভক্ত হয়, এবং ১৬৬২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত মোগলদিগের অধীন থাকে, উক্ত চারি সরকারের মধ্যে বাঙ্গলাভূম একটি। বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ লইয়াই বাঙ্গলাভূম। খৃঃ ১৬৬২ অব্দে আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি মীরজুম্লা আসাম অধিকার করিতে গিয়া পরাজিত হইলে, উক্ত চারি সরকারের মধ্যে তিন সরকারের অধিকাংশ ভূভাগ মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হয়। কেবল সরকার বাঙ্গলাভূম তাঁহাদের অধীন থাকে। সুতরাং ১৬০৩ খৃঃ অব্দ হইতে বাহারবন্দ মুসলমান রাজত্বের অন্তর্ভূত হয়। বাঙ্গলা জয়ের সঙ্গে ইহা ইংরেজ অধিকারে প্রবেশ লাভ করে।

"মোগলগণ কর্তৃক বাহারবন্দ অধিকৃত হইলে ইহা অন্যান্য পরগণার ন্যায় রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদিগের হস্তে অর্পিত হয়। তৎকালে জমিদারগণ রাজস্বসংগ্রাহকের কার্য করিতেন। বাহারবন্দ জমিদারগণের

হস্তে অর্পিত হইলেও অনেক সময়ে ইহা জায়গীররূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। চাঁদ রায় নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রথম জমিদার বলিয়া উল্লিখিত হন। তাঁহার পর রঘুনাথ রায় বাহারবন্দের জমিদারী প্রাপ্ত হন। রঘুনাথের পর তাঁহার পত্নী পুণ্যশ্লোকা রাণী সত্যবতী বাহারবন্দের অধিকার লাভ করেন। রাণী সত্যবতীর অগণ্যকীর্তি অদ্যাপি বাহারবন্দ অলঙ্কৃত করিতেছে। তাঁহার স্থাপিত দেবমন্দিরাদি আজিও তাঁহার পবিত্র নাম বিঘোষিত করিয়া থাকে। রাণী সত্যবতীর জীবনাবস্থায় বাহারবন্দ নাটোরাধিপতি রাজা রামকান্তের হস্তে অর্পিত হয়। রামকান্তের পত্নী ভারতপ্রসিদ্ধা দীনপালিনী রাণী ভবানী সত্যবতীর ভগিনীতনয়া ছিলেন, সত্যবতী সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করায় স্বীয় ভগিনীপুত্রীকে বাহারবন্দ অর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে বাহারবন্দ নবাব আলিবর্দি খাঁ মহাবৎ জঙ্গের আদেশে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৈয়দ আহাম্মদ খাঁ সালৎ-জঙ্গের নামে জায়গীররূপে নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু সেরেস্তায় নাটোর রাজের নামেই লিখিত থাকে। রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর রাণী ভবানী স্বীয় জামাতা রঘুনাথ রায়কে বাহারবন্দ প্রদান করেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর বাহারবন্দ পুনর্বার নবাব নজমউল্লা দৌলত সৈয়দ নজাবত আলি খাঁর নামে জায়গীররূপে নির্দিষ্ট হইয়া মুর্শি-দাবাদের অধীন হয়। কিন্তু রাণী ভবানীর সম্বন্ধ একেবারে দূর হয় নাই। রাজা গৌরীপ্রসাদ কিছুকাল ইহার জমিদার নিযুক্ত হন, কিন্তু পুনর্বার ইহা রাণী ভবানীর হস্তে আগমন করে। কোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর বাঙ্গলা ১১৭৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৭৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ঘনশ্যাম সরকার নামে এক ব্যক্তি ইহার ইজারা লয়। ১১৭৯ সালে ইহা রঙ্গপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভূত হয় ও সেই বৎসর বিষ্ণুচরণ নন্দী ইহার ইজারা লইয়া ১১৮০ পর্যন্ত নিজ অধিকারে রাখে, পরে ১১৮১ অব্দে কান্ত বাবুর পুত্র লোকনাথকে ৮২,৬৩৯ টাকায় চিরস্থায়িরূপে ইজারা দেওয়া হয়। আমরা ইতিপূর্বে কান্ত বাবু শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি

যে, রাণী ভবানী বাহারবন্দের জমিদার ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে লইয়া উক্ত পরগণা বিষ্ণুচরণ ও লোকনাথকে প্রদান করেন। বিষ্ণুচরণ কান্ত বাবুর বেনামদার ও লোকনাথ তাঁহার পুত্র। মহারাজা নন্দকুমার কাউন্সিলে ইহার জন্য হেষ্টিংসের প্রতি দোষারোপ করেন, এবং কাউন্সিলের সভ্যেরা তজ্জন্য হেষ্টিংস সাহেবকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। লোকনাথকে চিরস্থায়িরূপে বাহারবন্দ প্রদান করায় ডিরেক্টরগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পুনর্বার লইবার জন্য লিখিয়া পাঠান। কিন্তু হেষ্টিংস সে বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। বাহারবন্দ এক্ষণে কাশীমবাজার রাজবংশের সম্পত্তি। দানশীলা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ইহার অধিকারিণী। ইনি ইহার অগাধ আয় প্রতিনিয়ত পুণ্যকার্যে ব্যয়িত করিয়া বাহারবন্দকে দেশমধ্যে আরও স্মরণীয় করিতেছেন। এবং বাহারবন্দের পুরাতন নামের সহিত তাঁহার পবিত্র নাম মিশিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করিতেছে।"*

জনৈক লেখক লর্ড ক্লাইবের স্কন্ধে এই রাজ্যাপহরণের কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "রাণী সত্যবতীর স্বামী রঘুনাথ রায় বাঙ্গালা ১১৩০ সালে অভাব হন, তাহার পরে রাণী সত্যবতী জমিদারী প্রাপ্ত হন, এবং ১১৮৯ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাণী সত্যবতীর অভাব হইলে বাহিরবন্দ পরগণা নাটোরের রাজ্যভুক্ত হয়। পরে লর্ড ক্লাইবের সময়ে কাশিমবাজারের কান্তি বাবু বাহিরবন্দ প্রাপ্ত হন।"† বলা বাহুল্য, এই বর্ণনা সত্য হইতে পারে না ; লর্ড ক্লাইব সে সময়ে আদৌ এ দেশে ছিলেন না।

প্রাচীন রাজবংশের অধিকার হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইয়া কোম্পানী লাভবান হইতে পারিলেন না। প্রাচীন রাজবংশের অধীন প্রজাপুঞ্জ নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত, রাজস্বও যথাকালে

---

* মুর্শিদাবাদ হিতৈষী ;—পৌষ ; ১৩০২।

† গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

প্রদত্ত হইত। হেষ্টিংসের আদেশ যে সকল জমিদারী নূতন লোকের হস্তে সমর্পিত হইতে লাগিল, তাহার পুরাতন অধিকারিগণকে 'পেন্সন' দিতেই অনেক ব্যয় হইতে লাগিল; নূতন জমিদারগণও সবিশেষ শাসনকৌশলের পরিচয় দিতে পারিলেন না। ইহাতে দেশের মধ্যে অরাজকতা প্রশ্রয় পাইতে লাগিল।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক এবং স্যর উইলিয়ম হণ্টার, উভয়েই এই প্রকার পরিণামফলের কথা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রাণী ভবানী ইহার পূর্বস্থচনা অনুভব করিবামাত্র দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া গঙ্গাবাস আশ্রয় করিলেন। সম্পদ হইতে সম্ভ্রম অধিকতর মূল্যবান; রাণী ভবানীর হৃদয় সম্ভ্রম-নাশের প্রথম আঘাতেই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি যেদিন রাজসাহীর রাজ্যভার পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতেই রাজসাহীর গৌরব বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। অতঃপর কেবল রাজসাহীর রাজ্যনাশ-কাহিনীতেই রাণী ভবানীর বংশধরদিগের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

বাঙ্গলার জমিদারবর্গের কথা কালক্রমে ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জের সিংহাসনও বিচলিত করিয়াছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের শাসনভার পরিত্যাগ করিবার সময়ে, ইংলণ্ডীয় মহাসভা হইতে নূতন রাজবিধি প্রচলিত হইয়া, দেশীয় শাস্ত্র ও ব্যবহার অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহাই নব্যভারতের প্রথম সূচনা, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের প্রথম স্নেহবন্ধন, এবং পরবর্তী ইতিহাসের পূর্বসূচনা।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহের জন্য হেষ্টিংস Committee of Circuit নামে পরিচিত একটি ভ্রাম্যমাণ সমিতির উপর জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্তের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাটি কার্যকর হয় নাই।

২. রাণী ভবানীর জমিদারী হেষ্টিংস কিরূপে আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা রচনা করেন, সে-সম্পর্কে Impeachment of Warren Hastings গ্রন্থের লেখক P. J. Marshall-এর মন্তব্য প্রাসঙ্গিক : "In 1772 the Committee of Circuit farmed out Rajsahi to the hereditary Zamindar, the Rani Bhawani with her lands suffering from the effects of the great famine of 1770, the Rani was unable to maintain the Committee's assessment, which one of its members (Middleton) admitted had been overrated and two years later she was in arrears with her revenue. The situation was further complicated by a dispute over the succession, the Rani wanting the *Zamindari* to pass to her adopted son, Ramkrishna, who was opposed by a remote connection of her family. In 1774 the Governor and Council decided that she should be deprived both of the farm and the title of Zamindar, but after personal intercession with Hastings by members of the Murshidabad Provincial Council she was permitted to retain the title while the lands were let to another farmer. Ramkrishna, who had been managing the *Zamindari* for her, was expressly excluded from the succession.

The divisions in the Supreme Council gave Ramkrishna and the Rani an opportunity to stage a counter-attack. On 1 March 1775 Ramkrishna delivered a petition complaining of oppresions committed by the new farmer, Dulal Ray. A month later he produced a far more portentous petition alleging that over fifteen *lakhs* had been embezzled from the *Zamindari* by the *banyans* of Company servants—including Rs. 381,141 by Cantu Babu. Witnesses were examined on 12 May, who deposed that they had given Rs. 40,452 to Cantu, but no further steps were taken to investigate the accusation. On 19 May, however, after an examination of the original petition against Dulal Ray, the majority ordered that farm of the *Zamindari* should be restored to the Rani, with according to Hastings, 'the presumptine inheritence' to Ramkrisna. Even if he and the Rani had not,

as Vansittart believed, been plainly and repeatedly told that the success in their applications should depend upon their lodging accusations, they can hardly be blamed for thinking so." (p. 143-144)

পরিশিষ্ট

মহারাজ রামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজ্যাভিষেক

রাণী ভবানীর পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি রাজকুমারী তারা ও রাজ-জামাতা রঘুনাথ লাহিড়ীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবার আশা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ অকালে কালকবলে নিপতিত হওয়ায়[১] সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর রাণী ভবানী অনন্যোপায় হইয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] সেই দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ নামে বঙ্গদেশে বৈরাগ্যের অবতার বলিয়া পরিচিত।

রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও কিছু দিন পর্যন্ত রাণী ভবানীর হস্তেই রাজসাহীর রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল; তদুপলক্ষে মাতার সহিত পুত্রের কিয়ৎপরিমাণে মনোমালিন্যেরও সূত্রপাত হইয়াছিল। যুবক রামকৃষ্ণ স্বহস্তে রাজকার্য পরিচালন করিবার জন্য লালায়িত হইলেও, রাণী ভবানী সহসা রাজ্যভার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন বাঙ্গালী জমিদারগণের পক্ষে মহা সঙ্কটের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; মুসলমানের শাসনক্ষমতা তিরোহিত হইয়া কোম্পানী বাহাদুরের নূতন শাসনকৌশল প্রবর্তিত হইতেছিল। তৎকালে রাজসাহীর ন্যায় বিস্তীর্ণ জনপদের শাসনভার একজন অপরিণতবয়স্ক বালকের হস্তে সমর্পণ না করিয়া, বুদ্ধিমতী রাণী ভবানী স্বহস্তে শাসনক্ষমতা রাখিয়া, রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের সময় হইতে তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল। পদমর্যাদা ও শাসনক্ষমতা উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া রাণী ভবানী গঙ্গাবাস আশ্রয় করিলেন;—তৎসূত্রে রাজসাহীর রাজসম্পৎ মহারাজ রামকৃষ্ণের করতলগত হইল।

রাজসাহীর রাজবংশাবলীর ইতিহাসলেখক স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন;—"মহারাণী ভবানীর স্বর্গারোহণের পর

রামকান্তের দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজসাহীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।"* বলা বাহুল্য, ইহার একবর্ণও সত্য নহে। তবে মিত্র মহাশয়ের পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লিখিত বলিয়া ইংরাজদিগের নিকট এইরূপ অনেক অলীক কাহিনী ইতিহাস নামে পরিচিত হইয়াছে!

সেকালের লোকের নিকট রামকৃষ্ণ "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ বাহাদুর" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাদশাহ শাহ আলমের সনন্দবলে তিনি এই গৌরবান্বিত সুদীর্ঘ শূন্যগর্ভ রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীপতি মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ বাহাদুরের রাজ্যাভিনয় সময়েই নাটোর রাজবংশের সর্বনাশের সূত্রপাত হয়।

সে রাজ্যনাশকাহিনী বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। পরবর্তী যুগের ইংরাজ লেখকগণ তাহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণের বিষয়-বৈরাগ্যকেই একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের লিখিত কাহিনী কণ্ঠস্থ করিয়া কৃতবিদ্য স্বদেশবাসিগণও তাহাই শিরোধার্য করিয়া রাখিয়াছেন! নাটোর রাজদপ্তরে এবং কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডে এখনও যে সকল কাগজপত্র পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে, এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যায় না।

রামকৃষ্ণের ইতিহাস প্রাচীন জমিদারবংশের ধ্বংসকাহিনীর করুণ-ক্রন্দনে পরিপূর্ণ। মোগলগৌরবরবি মহাত্মা আকবরশাহের শাসনসময়ে বাঙ্গালী জমিদারদলের যেরূপ পদমর্যাদা ও শাসনক্ষমতা বর্তমান ছিল, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজেরা যখন দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন,[৩] তখন জমিদারদল পদগৌরবে ও শাসনক্ষমতায় সর্বত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।† মহারাজ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক

* Maharaja Ramkrisna, the adopted son of Ramkanta, succeeded his mother the Maharanee on her death. —K. C. Mitra, *The Rajas of Rajshahee*

† The Zaminders of Bengal were opulent & numerous in the

জমিদারদিগের সময়ে সেই পদগৌরব ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। সেকালের জমিদারগণ কি কৌশলে একালের উপাধি-ব্যাধিপীড়িত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম!

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনসময়েই বাঙ্গালী জমিদারদিগের শাসন-ক্ষমতা তিরোহিত হইতে আরম্ভ হয়। মোগলরাজ্যে জমিদারগণ কেবল-মাত্র করসংগ্রহের যন্ত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না; দেশের প্রকৃত শাসন-ভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তজ্জন্য মোগল রাজসরকারে তাঁহাদের পদগৌরব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে করসংগ্রহের যন্ত্রমাত্রই মনে করিয়াছিলেন; এবং এক যন্ত্রের পরিবর্তে অন্য যন্ত্র সংস্থাপিত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাতে অনেক প্রাচীন জমিদারবংশের ভূসম্পত্তি আধুনিক ধনশালী বিষয়বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণের করতলগত হইয়াছিল; কোন কোন স্থলে রাজ্যরক্ষার্থ পুরাতন জমিদার হেষ্টিংসের কথামত অধিক রাজকর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, কালক্রমে সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতির গতিরোধ করিবার আশায় হেষ্টিংসের প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কোম্পানী বাহাদুরের ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ করিতে গিয়া রাজকোষ শূন্য হইল, কিন্তু হেষ্টিংসের প্রবর্তিত রাজস্বনীতি উত্তরোত্তর অধিকতর রাজকর প্রত্যাশা করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া লাভের লোভে অনেক লোকে রাজসাহীর রাজ্য ইজারা লইবার জন্য প্রস্তাব

reign of Akber, and they existed when Jafar Khan was appointed to the administration under him and his successors their respective territorial jurisdiction appeared to have been augmented, and when the English acquired the Diwani, the principal Zaminders exhibited the appearance of opulence and dignity. —*The Fifth Report.*

উপস্থিত করিতে লাগিল, এবং অবশেষে কোন কোন স্থলে তাহাদের প্রস্তাব হেষ্টিংসের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া কার্যে পরিণত হইতে লাগিল।

ইহার জন্য রাজসাহী রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজাবিদ্রোহের সূত্রপাত হইল। কোম্পানী বাহাদুরের বীরবাহু তখন ফৌজ পাঠাইয়া বিদ্রোহ-দমনের চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রামে গ্রামে হাহাকার উঠাইতে লাগিল। নন্দলাল রায় নামক এক ব্যক্তি পরগণা আমরুল ইজারা লইয়াছিল, তাহার প্রার্থনাক্রমে নাটোরে লেপ্টেন্যাণ্ট কিন্‌লকের অধীনে কোম্পানীর ফৌজ প্রেরিত হইল।*

জমিদারগণ নানারূপ বাজে জমা আদায় করিতেন; তাহা ক্রমশঃ রহিত হইয়া তাঁহাদের আয়ের পথ সংকীর্ণ হইতে লাগিল। ১১৮৯ সালের বৈশাখ হইতে নূতন "ফৌজদারী রেগুলেশন" প্রবর্তিত হইয়া জমিদারদলের শাসনক্ষমতার মূলেও কুঠারাঘাত করিল।**

এই সময়ে রাজসাহী প্রদেশে কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে ইভলিন্ সাহেব রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত রাণী ভবানীর কলহের সূত্রপাত হইল। নূতন ইজারদারদিগের সহিত প্রজাবর্গের অকৌশল উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তিনি রাণীকেই তাহার জন্য অপরাধিনী করিলেন, এবং শাসন প্রবর্তিত করিবার জন্য পল্টন পাঠাইতে লিখিলেন।† রাজসাহী রাজ্যে পল্টনের শাসন শীঘ্রই প্রবর্তিত হইল।

---

* Letter to Lieutenant Kinloch, commanding in Natore, respecting disturbances of the rayats in Pargana Amrul.—*Bengal Mss Records. Vol. I. 37.*

** Circular letter to Collectors, informing them that the Fouzdari Regulation is to take effect from the 1st Baisak 1189.—*Bengal Mss Records. Vol. I. 44.*

† Letter to Governor General enclosing extract of a letter from Mr. Evelyn when at Rajshahye, respecting the obstructions thrown in the way of the collections by the Zaminder and her officers, and representing the necessity of having a military

ইহার ফল প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল না। ইভলিন্ সাহেব বুঝিলেন যে, প্রজাপীড়নমাত্রই সার হইল, রাজকর সংগৃহীত হইল না, কোম্পানী বাহাদুরের লাভ হইল না; ইজারদারের নিকট অনেক টাকা বাকি পড়িতে লাগিল !*

ইভলিন্ সাহেব যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলেন, তাহার ফলে রাজসাহীতে কোম্পানীর খাস শাসন ও করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল।†

রাজসাহী রাজ্যে কোম্পানীর খাস তহশিল প্রবর্তিত হইবার সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতে অনেক অর্থলোলুপ লোকে ইজারা লইবার জন্য লালায়িত হইল। তন্মধ্যে বলরাম শর্মা, জয়নারায়ণ দাস, কমলাকান্ত দাস, রুদ্রনারায়ণ শর্মা এবং রামকান্ত শর্মা নামক পাঁচ ব্যক্তি একত্র রাজসাহী ইজারা লইবার প্রার্থনা করায়, তাহাদের প্রার্থনাই গ্রাহ্য হইল। ইহারা আশানুরূপ অর্থশোষণ করিতে পারিল না; অনাবৃষ্টিবশতঃ প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল না; লোকে অবশ্যদেয় রাজকর প্রদান করিতেও ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। ইজারদারগণ হাহাকার করিতে লাগিল। কোম্পানী বাহাদুর তাহাদের করুণক্রন্দনে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, অনাবৃষ্টি জন্য কোনরূপ অনুগ্রহপ্রদর্শনের ব্যবস্থাও করিলেন না!

অনাবৃষ্টির পর শস্যনাশ এবং শস্যনাশের পর অন্নক্লেশ সমুপস্থিত হইল। তখন রাজসাহীর কালেক্টারও নীরব থাকিতে পারিলেন না।

force, under the command of a European officer, stationed in that province.—*June 18, 1782.*

* Letter from Mr. Evelyn, reporting the existence of heavy balances in Rajshahye, although the cultivators complain of undue exactions, and proposing to make an enquiry into the collections realised by the Amin.—*March 3, 1783. Approved.*

† Letter to Mr. John Evelyn directing him to conclude a khas settlement for Rajshahye for 1190.—*April 14, 1783.*

তিনি লিখিলেন যে, এ সময়ে রাজকরসংগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে, প্রজার উপর উৎপীড়ন করার প্রশ্রয় দিতে হইবে।*

রাণী ভবানী এই সকল দুঃখদৈন্যের মধ্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রজারক্ষার জন্য স্বয়ং ইজারাগ্রহণার্থ আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ১১৯১ সালের জন্য ২৪ লক্ষ ও তৎপর বৎসরে ২৫,০০০ অতিরিক্ত জমা স্বীকার করিয়া, রাণী ভবানী চারি বৎসরের ইজারা লইতে চাহিলেন[৪]।**

রাণী ভবানী প্রজার কাতর ক্রন্দনে অধীর হইয়া যেরূপ অগ্নিমূল্যে স্বরাজ্যের ইজারা সনন্দ গ্রহণ করিলেন, তাহা কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে মঙ্গলাবহ হইলেও, রাণীর পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইল না। এই বন্দোবস্তে কোম্পানীর ২৩৭৬০০ বার্ষিক অতিরিক্ত লাভ হইল বটে, কিন্তু প্রজার নিকট এত টাকা আদায় করিবার উপায় রহিল না।†

একে অন্নকষ্ট, তাহাতে পদবিচ্যুত ইজারদারগণ ও কোম্পানীর কর্মচারিগণ রাণী ভবানীর কার্যে পদে পদে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। তাহারা জানিত, রাণী অকৃতকার্য হইয়া ইজারা ত্যাগ করিলে, তাহারাই স্বনামী বেনামী ইজারদার হইয়া লঙ্কাভাগ করিতে

* Letter from Collector of Rajshahye stating that the crop has seriously failed and recommending the suspension of the ensuing *Kist* to prevent the former from oppressing the rayats. —*March 22, 1784.*

** Petition from vakil of Rajshahye enclosing a proposal from the Rani to farm her District for four years, paying 24 lakhs of rupees for the Bengal year 1191, and an annual progressive inorease of Rs. 25000 for the three succeeding years. —*April 25, 1784.*

† Letter to Governor General and Council, stating that the proposed new settlement of Rajshahye will afford an advantage to Government of Rs. 237600.

সক্ষম হইবে। রাণী ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন।*

রাণী ভবানীর শাসনকৌশল বিফল হইল। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও রাজকর পরিশোধ করিতে পারিলেন না। তখন কোম্পানী বাহাদুর তর্জন গর্জন করিতে ত্রুটি করিলেন না। রাজসাহীর কালেক্টার লিখিলেন যে, রাণীর পক্ষে রাজকর পরিশোধ করা অসম্ভব!**

অতঃপর রাণী ভবাণী নানারূপ কাকুতি মিনতি করিয়াও ফললাভ করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। রাজসাহীর রাজ্যনাশের পূর্বসূচনা উপলব্ধি করিয়া, তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ দশ সহস্র মুদ্রা "পেশকশ"[৫] প্রদান করিয়া রাজস্বসংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন!†

মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজসাহীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাজসাহীর জমিদারের সম্পূর্ণ ধনবল, পদগৌরব ও শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন না। মন্বন্তরের সময়ে রাণী ভবানী অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্নজল বিতরণ করিয়া রাজকোষের পূর্বসঞ্চিত অগাধ ধনরাশি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; রাজসাহী রাজ্যে ইজারদার নিযুক্ত হইয়া পৈতৃক পদগৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল; নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়া জমিদারের শাসনক্ষমতা খর্ব হইয়াছিল। সুতরাং রামকৃষ্ণের রাজোপাধি যতই সুদীর্ঘ হউক, তাঁহার রাজ্যাভিষেকসময়ে তাঁহার ধনবল, পদগৌরব ও শাসনক্ষমতা তদনুরূপ সৌভাগ্যবর্ধন করিতে পারিল না!

---

* Petition from Rani Bhabani stating the opposition & interruption she experiences from the officers of the Diwani and the Fouzdari Adawlat.—*August 23, 1784.*

** Letter from the Collector of Rajshahye, stating his opinion that it is impossible for the Rani to comply with the requisition of the Committee.

† Letter form the Governor General in Council directing Raja Ramkrishna to be invested with the Zamindari of Rajshahye and a demand upon him for Sikka Rupees 10,000 as a fee of investiture (Peshkash).—*August 20, 1788.*

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. রাণী ভবানীর জামাতা রঘুনাথ লাহিড়ির মৃত্যুকাল ১৭৪৮ খ্রীঃ।

২. রামকৃষ্ণকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণের তারিখ ১৭৫১ খ্রীঃ।

৩. আগস্ট ১৭৬৪ খ্রীঃ।

৪. Warren Hastings-এর আমলে জমির ইজারা সম্পর্কিত যে-সব নিয়মকানুন গৃহীত হয়, তার ফলে পুরাতন জমিদারির অবনতি এবং কোম্পানীর আমলা অথবা আশ্রিতদের ভাগ্যোদয় সম্পর্কে "The Transition in Bengal 1756—1775 : A Study of Saiyid Muhammad Reza Khan" বইয়ের লেখক ডঃ মজেদ খাঁ-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "Reza Khan had been defending the dignity and power of *Nizamat*, reminding the Company and its servants that Bengal was still a part of the Mughal empire, and that the Company was no more than the Diwan of the province. He also continued to defend the old order on the *diwani* side against Englishmen who more and more acted as though the country was theirs by neglect of conquest. Since the Khan had withdrawn his official, the amils, from the districts it was upon the Zamindars and Taluqdars than the hand of the supervisors fell—those 'soverings of the country···heavy rulers of the people, as Hastings called them····. He supported the claim of Rani Bhawani of Rajshahi to an allowance of Rs. 3,50,000, her usual income, but suggested that Rs. 2,50,000 might do."—পৃষ্ঠা ২১৬-২১৭।

৫. পেশকশ=উপহার/ঘুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাতা ও পুত্র

ইংরাজদিগের বিশ্বাস, মাতার ধর্মজীবনের আদর্শে চরিত্রগঠন করিতে গিয়া রামকৃষ্ণ বিষয়বুদ্ধিহীন জড়ভরতে পরিণত হইয়াছিলেন; এবং তজ্জন্যই তাঁহার রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়াছিল! এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, তাঁহারা আর ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

রাণী ভবানীর ধর্মজীবন ও রামকৃষ্ণের ধর্মজীবন এক শ্রেণীর হইলেও, একরূপ ছিল না। মাতা আড়ম্বরহীন কর্তব্যপালনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি একদিনের জন্যও রাজকার্যে অবহেলা করিতেন না। পুত্র ধ্যান ধারণা পুরশ্চরণাদি আত্মোন্নতির শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সময়ে সময়ে সংসারে থাকিয়াও শ্মশানবাসী সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্বকার্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।[১]

মাতার জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনি যেন পরের জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—পরের জন্য ভাবিতে, পরের জন্য খাটিতে, পরের জন্য প্রাণপণ করিতেই তাঁহার পুণ্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। পুত্রের জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যেন আত্মোন্নতি ও মুক্তিলাভের জন্যই নিরন্তর লালায়িত।

মাতা পুত্রের উভয়ের জীবনেই ধর্মের জন্য ঐকান্তিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত, তথাপি উভয়ের ধর্মজীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু পার্থক্য থাকিলেও, উভয়ের জীবনেই রাজ্যরক্ষার্থ প্রজাহিতৈষণার অভাব ছিল না।

রামকৃষ্ণ যোগী, বিষয়বিরাগী, আত্মত্যাগী; হিন্দু সমাজের পূজনীয় মহাপুরুষ। রাণী ভবানী রাজান্তঃপুরবাসিনী, অতুলৈশ্বর্যশালিনী রাণী,

অথচ নিয়ত পরহিতব্রতধারিণী, কল্যাণরূপিণী, দীনজননী মহাদেবী ;—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই তাঁহার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

রাণী ভবানী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল ; রামকৃষ্ণ যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষে এক অশ্রুতপূর্ব নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে যুগের প্রবলাবর্তে পড়িয়া ভারতবর্ষের লোকের বহুযুগার্জিত শাসন-প্রতিভা ভাসিয়া গিয়াছিল। রামকৃষ্ণ বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী না হইয়া সংসারকীট হইলেও, রাজ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন না।

তথাপি রামকৃষ্ণ বীরের ন্যায় প্রতিকূল ঘটনাবলীর সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজ্যরক্ষার জন্য, নাটোর রাজবংশের গৌরবরক্ষার জন্য, তিনি নবাগত ইংরাজ রাজের সঙ্গে যত কলহ বিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে জড়ভরত বলিয়া পরিচিত করা যায় না। বরং মনে হয়, রাজ্যরক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়াও কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, রামকৃষ্ণ নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া পারলৌকিক সদ্গতিকামনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা রক্ষক, রামকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহারাই ভক্ষক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিকে তাঁহার অন্নে আজন্মপ্রতিপালিত ভৃত্যবর্গ, অপর দিকে তাঁহার আশা ভরসা ও আশ্রয়ের আধার কোম্পানীর ইংরাজ রাজকর্মচারী,—দুই দিক হইতে এই দুই প্রবল শক্তি প্রচণ্ডবিক্রমে মুষলাঘাত করিয়া রামকৃষ্ণের রাজশ্রীকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহারাজ রামজীবন ও মহারাণী ভবানীর সময়ে নাটোর রাজবংশের রাজ্যোন্নতি, তাহার ইতিহাসের সহিত মুসলমান নবাব ও নাটোর রাজমন্ত্রী দয়ারাম রায়ের নাম চিরসংযুক্ত ; মহারাজ রামকৃষ্ণের সময়ে রাজ্যনাশ,—তাহার ইতিহাসের সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারী ও নাটোর রাজমন্ত্রী কালীশঙ্করের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া

রহিয়াছে।

কালীশঙ্কর দত্ত[১] যশোহর প্রদেশের একজন দরিদ্র কায়স্থসন্তান, প্রতিভাবলে নাটোরের রাজমন্ত্রী হইয়া উত্তরকালে নড়াল জমীদার-বংশের ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজের ইতিহাসে কালীশঙ্কর দস্যু-নামেই পরিচিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ জুন কালীশঙ্কর ও তাঁহার ভ্রাতা নন্দ দত্ত একখানি নৌকা লুঠ করিয়া নাবিকগণকে আহত করেন। যশোহরের কালেক্টার হেঙ্কেল সাহেব কালীশঙ্করকে ধরিয়া আনিবার জন্য কুতবুল্ল্যা পদাতিকের অধীনে এক দল সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন। কালীশঙ্কর ১৫০০ লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে হেঙ্কেলের সিপাহীদলকে পরাজিত করেন। ইংরাজ পক্ষে দুই জন ধৃত ও ১৫ জন আহত হয়। কালক্রমে নন্দ দত্ত ধৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু নাটোর রাজবংশের মন্ত্রিপদে আসীন থাকায়, কালীশঙ্করকে কেহ সহজে ধরিতে পারিল না। কিছুকাল পরে কালীশঙ্কর ধরা পড়িয়াও ধনবলে সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হেঙ্কেল, রামকৃষ্ণ বা কালীশঙ্কর কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি লিখিলেন,—"নাটোরের মহারাজ ভূষণা থানার শাসনকার্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন; দস্যুদল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসামী ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিতেছে!" এই হেঙ্কেল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ অক্টোবর হইতে রাজসাহীর জজ ও কালেক্টার হইয়া নাটোরে শুভাগমন করায়, সেই সময় হইতেই রামকৃষ্ণের সর্বনাশের সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে বৎসর বৎসর নূতন কর ধার্য হইত বলিয়া, রাজা প্রজা কাহারও মঙ্গল হইত না। ক্ষুদ্র সম্পত্তির অধিকারিগণ অল্পদিনেই সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারাও পতনোন্মুখ হইয়াছিলেন। জনৈক ইংরাজ লেখক বলেন, "এই সময়ে কোম্পানী বাহাদুর যথাসাধ্য শোষণকার্যে নিযুক্ত হইয়া জমীদার-দলকে প্রজাপালন বা উন্নতিসাধনের জন্য কিছুমাত্র উৎসাহদান

করিতেন না।"* ইহাতে প্রাচীন জমীদারবংশ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইতে লাগিল। দোষ কাহার? তৎসম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ লেখক স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজের দোষেই এই সকল সর্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল।†

এইরূপ অদৃষ্টবিড়ম্বনায় নিপতিত হইয়াও রামকৃষ্ণ যেরূপ ভাবে রাজ্য ও রাজসম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে, তাঁহার অলীক কলঙ্কে আস্থাস্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা ক্রমশঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়া, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

* Government had, it must be acknowledged, given the Zamindars little encouragement to rely on its generosity; it had acted far too much in the character of landlord determined to get the utmost out of his lands.

† But the truth is that the English added to the native system precisely those elements which producted all the evils; namely, watchfulness to seize any opportunity for new demands and power to enforce the demands they made.

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. জনশ্রুতি অনুসারে রাজা অথবা সাধক রামকৃষ্ণের লোকান্তরপ্রাপ্তি সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী যে-সব কাহিনী শোনা যায় সে-সবের প্রতিপাদ্য—'মহারাজ সশরীরে কৈলাসে গিয়াছেন', 'অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ তাঁহার অলৌকিক শক্তিলীলা প্রদর্শন করিয়া অকাশে বিহার করিতেছেন'। এইসব কাহিনীতে রামকৃষ্ণকে ঈশ্বর-সমর্পিত প্রাণ, তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। মহারাজ রামকৃষ্ণের সংসারবৈরাগ্য নাটোর রাজবংশের পতনের কারণরূপে অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে মহারাজ রামকৃষ্ণের দায়িত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ইংরেজ কোম্পানীর নীতি ও লক্ষ্যকেই অধিকতর দায়ী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অক্ষয়কুমারের সিদ্ধান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।

২. ইনি সমসাময়িক দলিলপত্রে কালীশঙ্কর রায় (নড়াইল জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা) নামে উল্লেখিত। 'Kalisankar was a man of wonderful energy and ability in business—my regard for truth compels me to say it—he was perfectly unserupulous'—Westland, p. 157. *See* also Hunter's *Jessore*, 2, p. 217.

"A dacoit and a notorious disturber of peace" quoted from Henkall's letters by Westland on p. 6 with his own remarks. Kalisankar appears to have been much more of a lathial Zamindar than a dacoit, ibid, p. 6.

সতীশচন্দ্র মিত্র—যশোহর-খুলনার ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ,
পৃঃ ৬১২—৬৮৯ ; ৭১৪—৭২০।

পরিশিষ্ট—২

A SHORT HISTORY OF NATORE RAJ

BY

A. K. MOITRA, B.L.

Pleader, Rajshahi

WITH

PREFACE & APPENDICES

BY

H. C. MOITRA, B.A.

NATORE.

Printed and Published by Jamini Kanta Bhaduri
at the Rani Bhavani Printing Works.
Natore.

PREFACE

Various attempts have now and then been made to collect materials for a systematic history of the Raj family of Natore, but so far, none of them has been crowned with success. Paucity of materials is the principal cause of such failures. Unsympathetic attitude and discouragement have tended not a little to frustrate the attempts of historical writers.

Scientific treatment of history was a thing quite unknown in Bengal even two decades ago. It is, however, now the cry of the day. Mere elaboration of tedious details interspersed with dates the accuracy of which cannot for one moment stand the test of serious reflection passed for a vivid narration of faithful historical facts. But now everything has changed ; a new era has dawned upon the enthusiastic band of patriotic scholars who are making researches in the domain of history for the illumination of the dark unfathomed caves which it bears in its bosom. No facts or figures are now accepted as truth without the crucial test of this class.

Babu Akṣhoy Kumar Moitra, B.L., Pleader, Rajshahi, is perhaps the pioneer of scientific historical writers. His ability in this respect is undoubted and unrivalled. The following pages, which are the production of his able pen, narrate in brief the accurate history of the Raj family of the Junior branch of Natore.

On the 21st January, 1911, the District Magistrate of Rajshahi, Mr. H. C. Barnes, I.C.S., wrote a confidential letter to Rani Hemangini Devi, the Managing Executrix to the Estate of the late Raja Jogendra Nath Roy Bahadur, requesting her to send him an historical account of the Raj family of the Junior Branch of Natore. In this letter he said that he had been ordered by Government to collect historical accounts of the principal ancient houses of this district for publication by the authorities. Since then repeated reminders were given by him

and his successors to expedite the work. The latest reminder came from G. Milne, Esq., I.C.S., the District Magistrate and Collector of Rajshahi. It was written on the 14th December 1911, and it bears number C. 42—49 J. In this letter he requested the Rani to supply him with requisite materials for compiling a brief but accurate history. Now these materials however, are not easily available. Those that probably remain are so seattered through misarranged documents, most of which are written in old Persian language, that no easier way can be found for gleaning real fact without first translating them into English or Bengali. Though we have commenced this work in right earnest, yet we are too diffident about the success we may achieve. The archives of Government, again, are not easily accessible even to persons of known ability. Difficulties of this nature confront us in every direction whenever any attempt is made to penetrate below the surface for looking into the real state of things.

It is with extreme regret that we have to express the fact that Raja Chandra Nath Roy Bahadur, the eldest brother of the late Raja Jogendra Nath Roy Bahadur, who had been an *attachee* to the Foreign Department of the Government of India, wrote a faithful account of the Raj family of Natore, but unfortunately this valuable manuscript has been lost. It is said that this MS contained facts which are now enyeloped in obscurity for ever.

It is also very painful to note here that the more valuable and older documents have all been destroyed among *debris* caused by the terrible earthquake of 1292 B.S. These and other causes have contributed to cast a veil upon the indispensable materials for preserving the glorious traditions of one of the most renowned houses in Bengal.

The history of the no less illustrious Tara, the only daughter of Maharani Bhavani, is also enveloped in mystery. How long she lived and where she passed her early and last days, nobody can now say with any degree of certainty. Everything

is based on tradition ; and tradition has painted her in the brightest and most charming colour. She was extremely pious and god-fearing. She built many temples, excavated several tanks, and spent most of her time in religious observances. Her works of piety and benevolence remain to this day at Natore and elsewhere, which amply testify to the sterling qualities of her head and heart. The year of Tara's marriage cannot be ascertained with accuracy. She was married to Raghunath Lahiri of Khajura, a village in the subdivision of Natore. Tradition has invested this wedding ceremony with such pomp, splendour and magnificence that even to this day people do not hesitate to compare it with the only other ceremony which was solemnized in Bengal, that of the *Srudh* of the mother of Ganga Govinda Singh, Dewan of Warren Hastings. She was surpassingly beautiful ; and like Marie Antoinette, the young dauphiness who became afterwards the ill-starred Queen of France, "decorating and cheering," to quote *Burke*, "the elevated sphere she just began to move in, glittering like the morning star, full of life and splendour and joy." Tara was not, however, destined by God to enjoy happiness in this world. The shadow was rapidly stealing on. Her husband died in the prime of his life in the year 1158 B.S. without leaving a single issue. And now the consolation lay only in *Byron's* famous expression "Who can reverse the dread decrees of fate ?" and in *Sir Cauline's* utterances (Percy's *Reliques*,)

> "Everye white will have its blacke,
> And every sweete its sowre."

That Serajudaula aspired to Tara's love is a fact well known to readers of history, but it is needless to repeat the unpleasant story here.

Tara's character may be best portrayed in the following words of *Spenser* :—

> "Whose onely joy was to relieve the needes
> Of wretched soules, and helpe the helpelesse pore :

All night she spent in bidding of her bedes,
And all the day in doing good and godly deedes,"
Faerie Queene,
Bk. I.

It is, however, a matterof common belief that Maharajadhiraj Prithwipati *Ramkrishna Roy* Bahadur, in his inordinate zeal for *Tantric* form of Hindu worship for which he spent most of his time in worship and meditation, utterly neglected the management and supervision of his vast estate and brought ruin and disgrace not only upon the whole family but even upon the prestige of his zemindary. During his administration considerable property was indeed spoiled by him. But it was his two sons, Biswanath (Barataraf) and Sivanath (Chhotataraf) who reduced the vast income of this estate almost to a minimum by boyish pranks and by engaging in civil and criminal litigations to a great extent.

It will be seen from the following brief sketch that a large number of influential zemindars of Bengal owe their origin mainly to the glorious traditions and fabulous wealth of the historic Raj family of Natore. The Rajas of Dighapatiya, Cossimbazar and Chowgram, the zemindars of Narail (Jessore), Taras (Pubna), the Mahommedan zemindars of Natore and Belgachi (Faridpur), the local Sukul zemindars, the Munshi family of Sherpur (Bogra), the Acharya Chowdhuries of Mymensingh, the Mukherjee zemindars of Gobardanga ('24-Parganas), the Lahiris of Kasimpur (Rajshahi) represented by the present Roy Kedarprasanna Lahiri Bahadur and a host of others too numerous to mention are indebted to this house for their material advancement in life.

It may not be out of place to mention here that the descendants of Maharaja Ramjivan are not the lineal progeny of the main stock or ancestor Maharaja Ramjivan's adopted son was Maharaja Ramkanta, who came from Chowgram (Natore, Rajshahi). Maharajadhiraj Prithwipati Ramkrishna Roy Bahadur's paternal home was at Atgram (Naogaon,

Rajshahi). Maharaja Govinda Chandra (Barataraf) came also from Atgram. Raja Ananda Nath (Chotataraf) and Maharaja Jagadindra Nath, the present distinguished representative of Barataraf, came from Harishpur, a suburb of Natore, and Maharaja Gobinda Nath (Barataraf) came from Baladkhal near Dighapatiya, Natore.

In conclusion, I beg to thank Babu Mathuranath Pal and Babu Tarini Kanta Phani, the Record-keeper, for the very valuable assistance they have given me in writing this preface and adding some appendices at the end of this book. I am, however, extremely grateful to Babu Bhavaniprosad Roy, Manager, and to Babu Troylakhanath Moitra, B. L., Assistant Manager, for showing me some interesting and valuable records which are still preserved in excellent condition.

Natore Raj, Junior Branch,
August, 12, 1912

HEM CHANDRA MOITRA B.A,

A SHORT HISTORY OF NATORE RAJ

BY

A. K. MOITRA

The members of the Natore Raj family belong to the Moitra family of Varendra Brahmans who trace their descent from Susen Muni, one of the five learned sages, said to have migrated from Kanauj in Upper India at the invitation of King Adisur, about 35 generations ago.*

Pedigree

Kamadeva Moitra (Rai) of this family was an officer under the zemindars of Lashkarpur, who are better known as Rajas of Puthia in the District of Rajshahi. He had three sons—Ramjivan, Raghunandan and Vishnuprosad, who were sent for education to Puthia, which was then a great centre of learning.

Raghunandan

The natural talent of Raghunandan, sharpened by education, induced Raja Darpanarayn to appoint him Vakeel of the Puthia Raj in the Darbar of the Nawab at Dacca, which was then the chief seat of the Moghul authority in Bengal. It was here that Raghunandan came to be recognised as a talented lawyer and financier, and so he was admitted into office as an assistant of the Kanungo. His official aptitude in handling complicated problems of land revenue paved the way for his future advancement in life and for the ultimate establishment of the historic Natore Raj.

* See Genealogical Table—Appendix IX

The transfer of the Moghul capital from Dacca to Murshidabad in 1702 A. D.[1] under Nawab Murshid Kuli Khan (otherwise called Jafar Khan by some of the historians) and the inauguration of the revenue settlement in Bengal, Behar and Orissa on the lines laid down by the great Akbar, offered rare opportunities to Raghunandan, who had by this time risen to the rank of a Dewan. The dewanship not only conferred on him a position of importance and honour, but it also clothed him with the powers of the Nawab in all the details of the revenue settlement. Defaulting zemindars, deprived of their properties, created opportunities for the rising man and from 1706 A. D. zemindaries came to be conferred on his elder brother Ramjivan who very soon acquired a reputation for vigour and capacity in the management of zemindari business.

Rare opportunities

The first zemindary, Pergunah Bangachi, made Ramjivan only a zemindar of minor importance. But the revolt and death of Uditnarayan, the influential zemindar of Pergunah Rajshahi, in the District of Murshidabad and Birbhoom, made Ramjivan the Maharaja of Rajshahi and raised him to the coveted position of the premier nobleman of Bengal. The death of Raja Ramkrishna, zemindar of Bhaturia, left his properties under the supervision and management of Maharaja Ramjivan for a short while, after which Bhaturia also came to be conferred on him, it is said, with the assistance of an ancestor of Justice Asutosh Chowdhuri. The defeat and capture of Sitaram Roy[2] who had assumed independence in Jessore and defied Moghul authority by killing Abu Torab, a captain of the Imperial army, left his vast territories at the mercy of the Nawab, who conferred the

Acquisition of properties

same on Maharaja Ramjivan. Other zemindaries, of minor importance, came to be conferred on him in quick succession until his zemindary of Rajshahi, as the whole estate came to be called, developed into gigantic dimensions, to be commonly called the estate of 52 lakhs. Its real founder was undoubtedly Raghunandan, but its grandeur and reputation were due, not so much to his official influence as to the management and energy of Ramjivan, and his efficient Dewan Dayaram Roy, the ancestor of the Dighapatiya Raj family.

Raghunandan passed most of his days at Baranagore in the District of Murshidabad, which was for a long time looked upon as the chief seat of the Rajshahi zemindary.

Maharaja Ramjivan

Ramjivan, on the other hand, resided at Natore where he built his Rajbari, embellished it with buildings, tanks and temples, and surrounded the habitation with three concentric *chowkies* or moats for protection against a sudden attack from outside. Maharaja Ramjivan appears to have been a patron of learning and the Sanskrit poem, *Krishna-padamkadutam*, composed in 1723 A. D. by his Court poet Sree Krishna[3] still bears testimony to the fact.

His last days

The last days of Maharaja Ramjivan were not, however, very happy. Raghunandan died in 1714. Kalikaprosad *alias* Kalookumar, the only son of the Maharaja, died soon after and the Maharaja had to adopt Ramkanta by conferring on his natural father the parganas of Chowgram in Rajshahi and Islamabad in Rungpur which are still held by his descendants, who are locally called the Rajas of Chowgram. On the death of Nawab Murshid Kuli Khan, the patron of the Natore Raj family in 1725 A. D.,[4] his son-in-law Suja Khan ascended the Mushnud of Bengal. In the midst of all these misfortunes, coming in quick succession, Maharaja Ramjivan breathed

his last in 1730 A. D.

The unwieldy zemindary of Rajshahi, now devolved upon the young Maharaja Ramkanta and his beloved consort Rani Bhavani, for whom Dewan Dayaram acted as guardian and superintendent and evinced great sagacity and integrity in the management of the zemindary. He was an extraordinary man. Having lost his parents in his infancy he found a father and patron in Maharaja Ramjivan, under whom he gradually rose to the highest position of the Dewan. The tact and valour displayed by him in the capture of Sitaram Roy earned for him the unqualified satisfaction of Nawab who also manifested his pleasure by conferring on him the distinguished title of Roy Royan.[5]

Maharaja Ramkanta

With such a man at the helm, the young Maharaja maintained the prestige of the Natore Raj family with efficiency as will appear from the fact that Nawab Suja Khan conferred on him the estate of Raghudeb of the Naldanga Raj family in 1737 A. D. when that zemindar had been found negligent and inefficient. But the frequent changes in the office of the Nawab, subsequent to the death of Murshid Kuli Khan, eclipsed the happiness of Maharaja Ramkanta, who came to be dispossessed for a time from his estate by the machinations of Debiprosad, the son of Vishnuprosad who laid claim to the Natore Raj as a nephew of Maharaja Ramjivan in preference to his adopted son. After this brief period of family feud, Maharaja Ramkanta again assumed charge of his zemindary, but he was not very happy in his last days. He was pious and painstaking, benevolent and wise. He died in 1748 A. D.,[6] leaving behind him his sole surviving daughter Tara and his beloved wife Rani Bhavani, who now assumed charge of the unwieldy Rajshahi zemindary.

Family Feud

It was at this stage that we find the first notice taken by the English authotitics regarding the illustrious Rani.

Mr. Holwell's Accounts

Mr. Holwell[7] noted that "At Natore about ten days' travel north-east of Calcutta resides the family of the most ancient and opulent of the Hindu princes of Bengal. Raja Ramkanta of the race of Brahmins, who deceased in the year 1748, was succeeded by his wife, a princess named Bhavani Rani, whose Dewan or Minister was Dayaram of the Teely caste or tribe; they possess a tract of country about thirty-five days' travel and under a settled government; their stipulated annual rent to the Crown was seventy lakhs of sicca rupees, the real revenues about one crore and a half".

Such was the estate in 1748 A. D. when it devolved on a Hindu widow. She was the only daughter of a

Rani Bhavani.

zemindar, named Atmaram Choudhuri and her birth place at Chhatingram still contains some of the ruins of her father's house which are held sacred by the Hindus. She embellished her birth place by dedicating landed properties for the religious observances in a temple built by her in which she had set up an idol in gold and named it Jayadurga after her mother's name. She and her daughter Tara were well-known for uncommon intelligence and business capacities. Rani Bhavani had fondly hoped to make over the charge of the Rajshahi zemindary to her daughter and son-in-law Raghunath Lahiri, but the premature death of Raghunath[8] obliged her to adopt Ramkrishna and retain the management of the estate in her own hands as long as she could.

The efficient management of the unwieldy zemindary of Rajshahi by this gifted lady for a period of half a century[9] during the dark days of Plassey, Udhunala,

Buxar, the double government and the great famine of the eighteenth century[10] which carried off one-third of the population of Bengal has clothed the annals of the Natore Raj with immortal glory, for which the people of Bengal feel a legitimate pride and for which Rani Bhavani is still looked upon as the "Heroine of Bengal."

Her Administration

The name of Rani Bhavani has, however, been handed down to posterity as a household word, not so much for her administrative capacities, as for the qualities of her head and heart which enabled her to devise and carry out benevolent acts of permanent public good to the people and of her native land. The fabulous wealth of the estate under her administration gave a free scope of her piety in building hundreds of temples in Benares, Baranagore, Bhowanipur, Natore and other places and in giving valuable properties with charge of maintaining worship of idols. Some of these institutions still exist and daily supply many people with a free gift of food. The tanks excavated by her, the roads and bridges built by her, testify to the keen interest she took in removing the principal wants of the people of her time. But her sagacity perhaps was best displayed in the permanent *Nagadbrittwi* grants with which she charged her properties for the encouragement of learned scholars who maintained schools of Sanskrit learning and for the support of helpless Hindu widows who had none to look after them. Her physicians distributed medicine from door to door and her maid servants were employed in feeding the beasts, birds, and insects. As a self-denying pious Hindu widow, passing her days in austere religious observances, she had time, in the midst of her multifarious duties to attend personally to all petitions presented for redressing the

Public works of utility

grievances of her tenants. She conferred rent-free lands on pious Brahmins, on deserving persons of other castes and also on Mahomedans of saintly disposition. All this, however, was put to shade when she came forward to save the lives of her countrymen during the great famine, and exhausted all the resources of her vast estate in the act of boundless philanthropy

Hastings, however, had his own ideas about the growth of zemindaries in Bengal, and referring to the Rajshahi

Hastings

zemindary in particular, he noted in his Memoirs[11] relative to the state of India that "The zemindari of Rajshahi, the second in rank in Bengal and yielding an annual revenue of about twenty-five lakhs of rupees has risen to its present magnitude during the course of the last eighty years, by accumulating the property of a great number of dispossessed zemindars, although the ancestor of the present possessor had not by inheritance a right to the property of a single village within the whole zemindari." This was a prelude to the step which he eventually took in wresting from Rani Bhavani the large estate of Baharbund in Rangpur and investing the same in his Banian Kanta Babu,[12] the ancestor of the Maharaja of Cossimbazar. This was the first break up which the Natore Raj estate suffered and it was due to no fault on the part of the Rani.

"The zemindars of Bengal," says the Fifth Report,[13] were opulent and numerous in the reign of Akbar and

Old zemindaries

they existed when Jafar Khan (Murshid Kuli) was appointed to the administration. Under him and his successors their respective territorial jurisdictions appeared to have been greatly augmented and when the English acquired the Dewani,[14] the principal zemindars exhibited the appearance of opulence and dignity." They were not mere collectors of revenue, "they

exercised criminal powers and crime was considerably repressed." One distinguished Government officer in his paper on the "Territorial Aristocracy of Bengal" in the Calcutta Review, noted that "The remains of a jail and the spot where the gibbet had stood attest the activity as well as severity with which the criminal authority of the Rajas of Natore was exercised. But during the English *regime* all this was changed. The Rajas were deprived of the powers of Magistrate and a single officer was appointed as Magistrate, Judge and Collector of Natore." A local poet has left a humorous account of the first serious trial at Natore in which the white judge has been compared to a God and his officers have been compared with the priests and executioners who officiate in sacrificial ceremonies.[15] The poet has incidentally noted with disgust that the new administration did not then hesitate to punish even the female with stripes.

Criminal Administration

When these changes were gradually coming over the country and when the administrative powers of zemindars were about to be curtailed in every direction, Rani Bhavani retired to Baranagore, making over the charge of the estate to her adopted son Ramkrishna, a pious and unfortunate nobleman who had to bear witness to the ruin of his estate without getting an opportunity to retard its downfall. The great famine had left the lands waste and uncultivated and the revenues greatly affected by the calamitious visitation. Crime was rife on all sides, there was little or no security of life and property. Pandita, Karticka, Fathu, Jitu, and other dacoits were pursuing their avocations with impunity. Mr. Strachy, the Third Judge of the Calcutta Court of Circuit, in his report, dated Natore, the 13th June 1808, summarised the causes which led to

Retirement of Rani Bhavani

this state of things on the assumption of direct administration by the Hon'ble East India Company.

It was a period of *inter regnum* so to say, when the old order of things had vanished but no order had yet been established to cope with the difficulties of the situation. It was at this juncture that Maharajah Ramkrishna, an extremely pious and god-fearing man, assumed charge of the Rajshahi zemindary. Although his memory is still cherished as that of a saint, most writers have not hesitated to accuse him of incapacity and negligence and some have gone the length of quoting anecdotes to prove that the disintegration of the estate gave him particular pleasure, and he worshipped his Goddess Kali with greater zeal as the properties were one after another sold in auction for the realization of arrears of revenue. Ramkrishna had, however, been more sinned against than sinning. In reality he was neither incapable nor negligent in the management of his vast estate but when he was deprived of the criminal jurisdiction by the East India Company and failure of his prayer for empowering him to make *putni* settlement of part of his property broke his heart and so he spent most of his time in worship and meditation. His friend, philosopher and guide was his Dewan Kalisanker Roy,[10] the ancestor of the Narail zemindars of Jessore.

Maharajah Ramkrishna*

Bhusna in Jessore was the first property which gave trouble to Maharaja Ramkrishna. He leased it out in 1793 to his Dewan Kalisanker in the hope of profitting by the settlement but being disappointed in that behalf, he transferred it by a *hibanama* in 1795, December, to his infant son Biswanath in the hope that the Court of Wards will not allow the estate of the infant to be sold for arrears of revenue. Mr. Earnest was appointed Commissioner of Bhusna in 1797 and he fixed the entire rental

at 3,27,800, assessing the revenue at 2,48,118. Biswanath refused to take back the property but the Court of Wards ruled that the estate was responsible for its arrears of revenue and so it was sold piece-meal in 1799. The Permanent Settlement by assuming a rental in excess of the reality precipitated the ruin of the Natore Raj and Maharaja Ramkrishna failing in his attempt to secure permission for raising money by making *putni* settlement died a broken-hearted man having been actually placed under restraint by the Collector for the realization of the arrears of revenue due from his estate.

Biswanath, Sibnath

Rani Bhavani tried for a time to tide over the difficulties by resuming charge of management on behalf of her grandson, but she too could not save the estate from ruin. Maharaja Ramkrishna left two sons, Biswanath and Sibnath, and they took charge of the residue of their paternal estate and henceforth the Raj family came to be divided into two branches, called the Senior and the Junior (Barataraf and Chhotataraf).

Anandanath

The Chhotataraf represented by Maharaja Sibnath devolved on his son Raja Anandanath Rai Bahadur, C.S.I., who was a sharp and shrewd man. He received from Government the title of Raja Bahadur and was also made a C.S.I. in recognition of his loyal services to Government. He erected at Rampur Boalia a building for a library which was called after his name. He was orthodox and conservative, yet he was liberal-minded in doing acts of public good. He died in 1866 leaving behind him four sons, Chandranath, Kumudnath, Nagendranath and Jogendranath.

Chandranath was invested with the title of Raja Bahadur and was appointed an *atachee* to the Foregin Office of Government of the India. By his education and

culture he was well known all over India. As a patron of learning he helped the establishment of a Female Normal School at Rampur Boalia, and supported Sanskrit scholars and musicians with liberal grants. In his day Raja Chandranath was looked upon as one of the most enlightened noblemen of Rajshahi. His brothers Kumudnath and Nagendranath met with premature death and on his own death in 1875 the Chhotataraf estate devolved upon Jogendranath whose memory is still cherished as that of a nobleman who was well-known for the fearless advocacy of his just rights against all encroachments upon his legitimate authority. He was a benevolent man, but he loved to give away with the right hand what the left could not know. He supported many poor helpless school boys and gave monthly allowances to disabled persons, Sanskrit scholars or Pandits and deserving people without any distinction of caste, creed or colour. He excavated several tanks for the supply of pure drinking water and established a Sanskrit *tole* at Natore. His private charity knew no bounds. He was, however, very unfortunate in his last days. His only son Kumar Jitendranath died of pneumonia at Calcutta in his presence, leaving an infant son, Kumar Birendranath who is still in his minority and is being educated at Calcutta. After the death of Raja Jogendranath in 1308 B.S., the management of Chhotataraf estate was conferred upon a body of trusted executors by the last Will of Jogendranath and his daughter-in-law Rani Hemangini as the managing executrix of the estate has been adding considerably to the Chhotataraf estate and building anew the Rajbari which was demolished by the earthquake in 1897. She is a lady of very charitable disposition and of public

Chandranath and his brothers

Kumar Jitendranath and his son Kumar Birendranath, Rani Hemangini

spirit. To remove a public inconvenience she has built a screw-pile iron bridge over the Narad river at Natore at a very considerable cost and loss to her estate. This bridge is known by the name of "Raja Jogendra Nath Roy Bahadur Memorial Bridge." A charitable dispensary was established at one of her moffusil cutcheries (Mangalpara) which is situated in a malarious part of the country. The cause of education could not also escape her notice as a large Sanskrit *tole* is maintained by her and a large number of poor students depend upon her for education. She gives sufficient pecuniary help to students going up for the B.A. and M.A. degree Examinations of the Calcutta University. Being a lady brought up in the best traditions of her family and following the sacred foot-prints of her father-in-law, she keeps her purse always open for the poor and needy.

REFERENCES

1. When Murshid Quli (Jafar) Khan, the diwan of Bengal, removed the provincial revenue headquarters from Dacca to this place in 1704, it came to be called after him, *Murshidabad*, instead of its former name *Makhsusabad* or the Select City. Sir Jadunath Sarkar, "Old Murshidabad", *Krishnath College Centenary Volume*, p 131. For a detailed discussion of the circumstance in which the seat was transferred from Dacca to Murshidabad, *see* Dr. A. Karim—*Murshid Quli Khan and His Times*, p. 18—22.

2. "In pride of power he (Sitaram Roy of Bhushna) humbled and robbed the smaller zamindars of the country round and stopped sending any revenue to the Subahdars'. His success was made easier by the supreme rule of Ibrahim Khan (1689—1697) and the friction between Murshid Quli and Azim-us-shan which lasted till 1710. At last in 1713 when he killed Sayid Abu Turab, the Faujdar of Hugli, Murshid Quli could no longer overlook his audacity. A strong force was detached under Murshid Quli's relative Baksh Ali Khan (newly appointed Faujdar of Bhushna); and with the help of all the neighbouring zamindars' levies, Sitaram was overwhelmed and captured with his family, and his capital was sacked (Feb-March 1714). Thus fell the last Hindu Kingdom in Bengal—Sir J. N. Sarkar (Ed.) —*History of Bengal*, Vol II, p. 416.

3. This information is dubious. The author of *Krishnapadamkadutam* was Sri Krishna Sarbabhauma. This work was composed in 1723 by Sri Krishna when he enjoyed the patronage of Raghuram Roy, father of Krishna Chandra Roy of Nadia.

4. Murshid Quli died on 30 June 1727 and was succeeded in the same year by his son-in-law Sujauddin

Mohamed. ***See*** **Sir J. N. Sarkar (Ed.)—*History of Bengal*, Vol. II pp. 399 and 422.**

5. **Roy Royan was the principal officer of the *Khalsa* or revenue department. (N. K. Sinha—*The Economic History of Bengal*, Vol II, p. 1)**

6 **The death of Ram Kanta took place in B. S. 1155, Sravan, corresponding to A.D. 1748.**

7. **J. Z. Holwell (1711—1798) arrived in Calcutta as Surgeon's mate on an Indiaman ; employed as Surgeon in the Company's ships to the Patna factory ; at the Dacca factory ; at Calcutta, 1736—48 ; alderman : principal surgeon : twice Mayor, perpetual *zamindar* of the 24-Parganas in 1751 ; seventh in the council : when the fort at Calcutta was attacked by the Nawab Siraj-ud-daula on June 18, 1756, and the Governor Drake and others retreated down the river on the 19th, Holwell was called on to take charge of the defence. He was one of the 23 survivors of the persons confined in the Black Hole ; was sent to Murshidabad and kept in irons there ; set at liberty, July 17 ; joined the ships at Fulta . ...succeeded Clive as temporary Governor of Bengal from Jan. 28,1760 until Vansittart assumed office on July 27, 1760....... In retirement, he wrote on historical, philosophical and social science subjects ; also his *Narrative of the Black Hole*, *Interesting Historical Events relative* to *the Province of Bengal* and *The Empire of Hindustan* 1765—71, *Indian Tracts*, 1758, 1774 and other works showing his knowledge of the religion and customs of the Hindus. (C. E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography*, pp. 205-206.)**

8. **Raghunath son-in-law of Rani Bhavani, died a premature death in 1158 B.S. corresponding to 1751-52 A.D.**

9. **The years of personal rule of Rani Bhavani cover the years 1748—1802 A. D.**

10. **By 'great famine of the eighteenth century' is meant the Famine of 1770.**

11. Warren Hastings, *Memoirs Relative to the State of India*, 1786.

12. Krishna Kanta Nandy, better known as Kanta Babu served as a banian first of Francis Sykes and later of Warren Hastings. For details of his life and work, *see* Somendra Chandra Nandy, *Life and Times of Cantoo Baboo, Vol. I.*

13. *Fifth report from the Select Committee of the House of Commons on the East India Company*, 1892, edited with an introduction by Rev. W. K. Firminger, 3 Vols, Calcutta, 1917.

14. August 1765.

15. For an account of references to poems and satires on the Judicial administration as set up by the British Indian Government, *See* Chap. IV, *Heto Bai Heto Chhara*, by Bireswar Bandyopadhyay, pp. 49—54.

16. The author of *Jasohar-Khulnar Itihas* (2 Vols.), Satish Chandra Mitra gives details about the career of the founder of the Narail zemindary, Kalisankar Roy (p. 689 and 712 ff).

APPENDIX I

The historian tells us that *Susen Muni* came to Gour about 35 generations ago at the time of *Adisur*.—The very existence of this king is now disputed (*vide* the Author's recent work "*Gourarajmala*," Volume I, Part I, pages 57—59. There the author calculates each generation by 25 years. If the existence of Adisur be admitted, then we can get at the period he flourished in by multiplying the two figures (*i.e.* $35 \times 25 = 875$ years).

APPENDIX II

The *Ekrarnama* which was executed by Maharajadhiraj Prithwipati Ramkrishna Roy Bahadur (1198 B. S., 3rd Kartick, corresponding to 1791, 17th October) in favour of the system of Government then prevalent in Bengal for revenue for ten years from 1197 to 1206 B. S. amounting to the huge figure of Rs. 2,19,27,003, 11 as. and 15 gandas reveals the fact that his annual revenue was then no less a sum than Rs. 22,52,200, 5 as. 19 gandas and 2 karas. The same document also gives us an insight into the state of the country which existed at that time. The terrible famine of 1176 B. S. (1170—1171), during the time of Rani Bhavani, opened up disgraceful opportunities for the nefarious depredations of the notorious thieves, dacoits and a legion of other villains. This famine lasted for one year and 9 months; but its dire effects continued for at least forty years. However, these dacoits roamed over the country defying all established laws, usages and customs. And, therefore, Maharajadhiraj Prithwipati Ramkrishna Roy Bahadur, for

such was his title, agreed to keep a lynx-eyed watch upon these scoundrels, and to protect and safeguard the lives and interests of peaceful and law-abiding people and in case of their being molested or looted, to arrest them with stolen property and to produce them forthwith along with the complainant in courts established by the British Raj. About the prevalence of dacoits at that time, Sir W. Hunter says, "many of the principal families throughout the country, being dispossessed by the Musalman tax-gatherers in whole or part of their lands, lived by plunder." Again, "Bands of cashiered soldiers, the dregs of Musalman armies, roamed about plundering as the they went, etc," Letter of the 13th April, 1771, from Mr. Rous, the Supervisor of Rajshahi, also speaks of the same state of affairs. Dacoits in the garb of *sannyasis* were most frequent in those days, *Vide* letter from the President and Council (Select Committee) to the Court of Directors, January 15,1773.

APPENDIX III

The author says, *"This was a prelude to the step·········his banyan, Kanta, the ancestor of the Maharaja of Cossimbazar."* Here Beveridge's* remarks may be quoted "It was these *thika khalaris*, too, which Kamal sublet in Baisakh 1181 (April 1774) to Hasting's banyan Kanta Babu. The Petition (1100) speaks of Babu Leeknace and Nundee as the sub-lessee, but I need hardly observe that this is a misprint for Lok Nath Nandi, the infant son of Kanta Babu, in whose name he took Pargana Baharband. This agrees with the remarks of General Clavering in the minutes of 30th December 1774 and 12th May 1775 about the con-

* H. Beveridge, *Trial of* *Nanda Kumar*

nection between Kamaluddin and Kanta Babu." Again, "Mr. Peter Moore, when examined in Hasting's trial, gave very strong evidence against Ganga Govindo. He also referred to Kanta Babu's zemindari of Baharband, and said that the engagement was for Rs 82 or 83,000, while the settlement with the raiyats was for Rs. 3,53,000. In July 1774, Hastings described Lok Nath Nandi as a man of credit, and therefore, a proper person to have charge of the Baharband zemindari. Lok Nath was then a mere child, and when the majority taxed him with the description of him, Hastings replied that every-body knew that the practice of *benami* was prevalent in India, and that his description referred in fact to Kanta, who was the real farmer. Kanta, however, told the majority that Lok Nath was the real farmer, and that if he died the farm would lapse to the Company." The same celebrated historian again says, "I have since gone further into the subject, and I think that I can now establish the fact that he was Kanta Babu's *benamidar or farzi.*"·········Lok Nath was a minor in 1775, being, in fact, a boy of about twelve years of age, if so much, yet Hastings had the hardihood to describe him, in a revenue consultation of 12th July, 1774, as a man of substance and credit."

APPENDIX IV

That Maharaja Ramkrishna was an eye-sore to Hastings will be evident from the following quotation from the "*Trial of Maharaja Nanda Kumar*;"* In the same letter (i. e. of the 18th May, 1775, which was written by Hastings in less than a fortnight after Nanda Kumar had been flung into jail, he incidentally gives a striking proof of

* By H. Beveridge

the terror which was created among his native accuser by Nanda Kumar's commitment. After mentioning that Dalil Rai, the farmer of Rajshye, had been dismissed, and Rani Bhowani restored. and that one Nanda Lal had also been dismissed because he had tried to dissuade Ramkrishna, the adopted son of the Rani, from engaging in the 'dirty work proposed to him (i.e. accusing Hastings,) and because he had at last separated himself from Ramkrishna, he adds, "After Nanda Kumar's commitment, the young scoundrel (Ramkrishna) sent an emissary to Kanta, entreating my forgiveness, and offering to reveal the arts which had been practised on him by Nanda Kumar to compel him to put his seal to the petition, if I would signify my approbation of it; but the General sent for him, took a second petition in confirmation of the former, and he is now tied down to the party for ever."

APPENDIX V

That Nanda Kumar was an enemy of Rani Bhavani is a fact which will be brought home to the readers by the following lines from Beveridge :—"I also learn from his work (i. e. Babu Mahima C Majumdar's learned work on the Brahmans of Gour, page 114) that Nanda Kumar was an enemy of Rani Bhavani, and prevented her getting the management of her zemindaries on the death of her son-in-law, Raghunath, in 1158 B. S. (1751-52). She afterwards got the management by the help of her servant Daya Ram. This account tallies with an early letter of Hastings, where he speaks of Nanda Kumar trying to overset Daya Ram."

APPENDIX VI

Names of the Ranis placed against those of the Rajas :

1. Ramjivan ... ... Bhubanmohini or Gouri
2. Ramkanta ... ... Rani Bhavani, died 1209 B. S. Bhadra
3. Ramkrishna ... ... (*a*) Sankari or (*b*) Sundari or (*c*) Jagadamba or (*d*) Sivasundari
4. Biswanath ... ... (*a*) Joymani, died 125? B. S., 20th Falgoon; (*b*) Krishnamani, died 1254 B S., Falgoon; (*c*) Govindamani.
5. Sivanath ... ... (1) Bisseswari, died before the partition of the estate; (*a*) Dakshina; (*b*) Haripriya, died 1267 B S. 5th Ashar; (*c*) Jagadamba; (*d*) Ratanmani; (*e*) Gourmani; (*f*) Kasiswari; (*g*) Annapurna; (*h*) Sonamani; (*i*) Karunamani or Kripamoyi
6. Govinda Chandra ... (*a*) Sibeswari
7. Anandanath ... ... (*a*) Sivasundari died 1295 B. S., 27th Baisakh
8. Govindanath ... ... (*a*) Brojosundari, died 1319 B. S. 17th Bhadra
9. Chandranath ... ... (*a*) Kshetramani, died 1314, 10th Bhadra

10. Kumudnath, born 1254, died 1279 B. S., 14th Magh ...	(a) Swarnamoyi, died 1314 B. S., 6th Magh
11. Nagendranath, died 1278 B. S., 10th Aswin	(a) Basanta Kumari.
12. Jogendranath ...	(a) Kumudini, died 1309 B. S, 21st Bhadra
13. Jitendranath, born 1280 B. S., died 1304 B. S., 3rd Magh ...	(a) Hemangini.
14. Birendranath, born 1303 B. S., 27th Magh	Unmarried.
15. Maharaja Jagadindranath adopted, 29th Agrahayan, 1276 B. S., when only 14 months old	(a) Shyammohini
16. Jogindranath, born 1302 B. S., ...	Unmarried

APPENDIX VII

Dates of some important events

Death of Raghunandan	...	1714 A. D.
" Maharaja Ramjivan	...	1730 A. D.
" Ramkanta	...	1748 A.D., 1155 B.S., Sravan.
Raghunath Lahiri	...	1751-52 A. D. 1158 B. S.
Great Famine	...	1176 B. S.
Death of Maharaja Ramkrishna	...	1203 "

Death of Rani Bhavani ...	1802 A. D. September 5, 1209 B. S., Bhadra
Death of Sivanath ...	1224 B. S., 24th Magh
„ Biswanath ...	1220 „
„ Govinda Chandra ...	1836 A. D., 1243 B. S., Agrahayan
„ Anandanath, born 1222 B. S. ...	1866 1274 B. S., Sravan.
„ Gobindanath ...	1274 B. S., Falgoon
„ Chandranath, born 1251 B. S. ...	1282 „ 10th Agrahayan
„ Jogendranath, born 1264 B. S. ...	1301 „ 8th Bhadra

APPENDIX VIII

Miscellaneous Notes

The name of Maharani Brojosundari's father is Golokchandra Lahiri, of Hatikoomrul (Pubna).

The name of Rani Kumodini's father is Mohini Mohan Roy, zemindar and Vakeel, High Court, Calcutta.

Govinchandra Sirkar of Baladkhal, gave away his third son to Maharani Siveswari for adoption who is known by the name of Maharaja Govindanath.

The name of the natural father of Raja Anandanath is Ratikanta Roy of Harishpur.

The father's name of Rani Sivasundari, Anandanath's wife, is Ramnarayan Majumdar of Brikutsa

The names of the natural father and mother of the present distinguished Maharaja Jagadindranath Roy Bahadur are Srinath Roy and Prosannamoyi Debya of Harishpur.

Babu Umaprasad Roy's (Amhati, Natore) daughter is Rani Hemangini Devi, the guardian-mother of Kumar Birendranath Roy.

নির্ঘণ্ট

রাণী—১৪

—